মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি

২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬

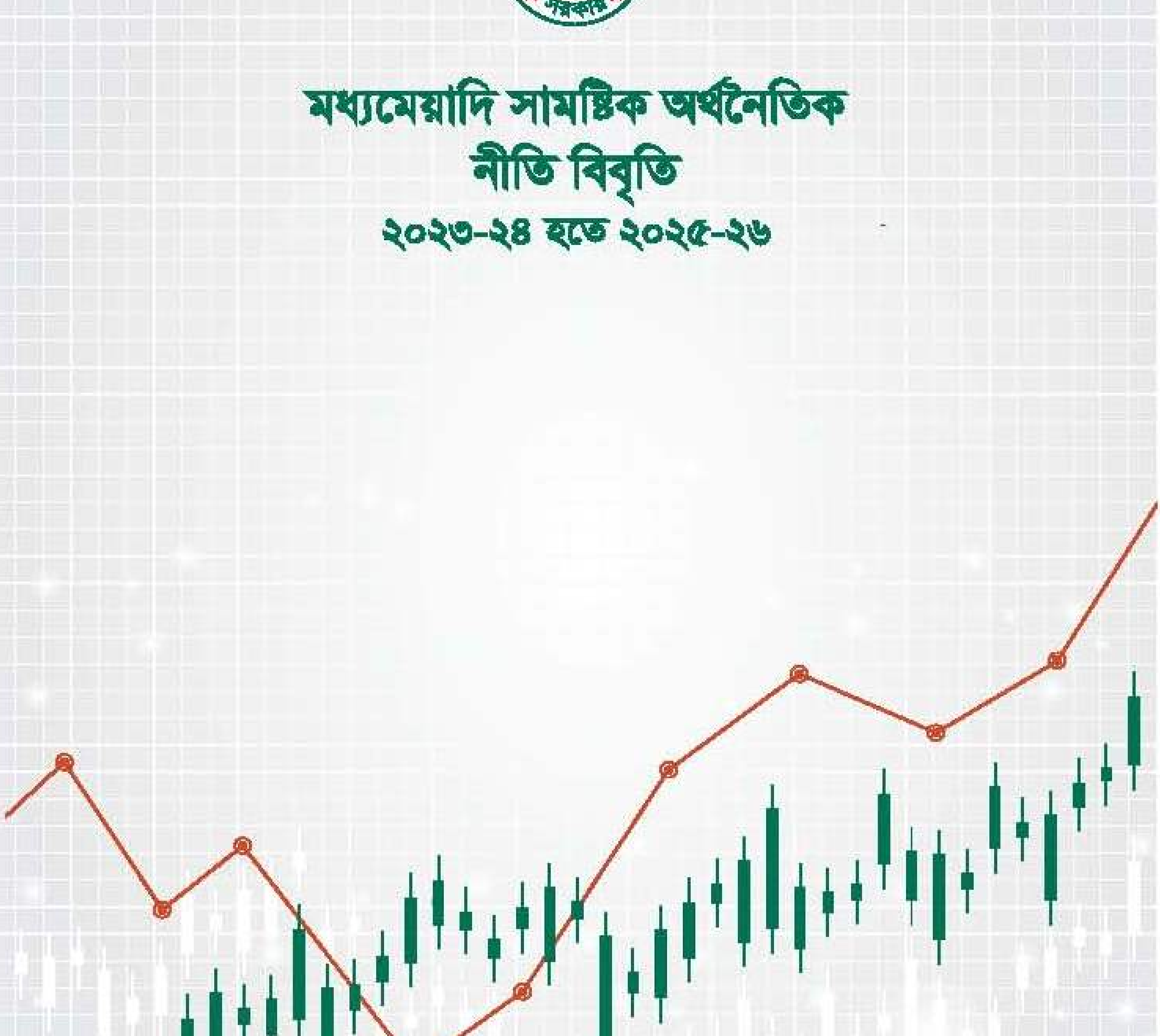

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক
নীতি বিবৃতি

২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬

সরকারি অর্থ ও বাজেট
ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯-এর
১১ ধারা অনুযায়ী মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ / ১ জুন ২০২৩)

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইটঃ www.mof.gov.bd

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন

প্রধান উপদেষ্টা:	ফাতিমা ইয়াসমিন, সিনিয়র সচিব
সম্পাদকঃ	রেহানা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব

প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দঃ

দিলরুবা শাহীনা, অতিরিক্ত সচিব
ড. জিয়াউল আবেদীন, যুগ্মসচিব
ড. শেখ মনিরুজ্জামান, যুগ্মসচিব
মোহাম্মদ জহিরুল কাইউম, উপসচিব
মোস্তফা মোরশেদ, উপসচিব
ড. মোঃ রাশেদুর রহমান সরদার, উপসচিব
ড. জয়নাল আবদিন, উপসচিব
তৌহিদ ইলাহী, উপসচিব
ফরিদ আহমেদ, উপসচিব
আবদুল মন্নান, সিনিয়র সহকারি সচিব
মোঃ রকিবুল হাসান, সিনিয়র সহকারি সচিব
সুহানা ইসলাম, সিনিয়র সহকারি সচিব

যোগাযোগের ঠিকানা: অতিরিক্ত সচিব, সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

টেলিফোন: (+৮৮০)-২-২২৩৩৫৬০১৯

ইমেইল: parveenrehana@yahoo.com

ওয়েবসাইট: www.mof.gov.bd

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কিছু তথ্য সাময়িক, যা পরবর্তীতে পরিবর্তন হতে পারে।

ISSN 978-984-35-2578-9

মুখবন্ধ

মানুষ একমাত্র প্রাণী যারা উদ্ভাবনী মেধা, প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার আগ্রহ এবং প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঘুরে দাঁড়াবার শক্তিতে এ পৃথিবীতে উন্নত-বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ গঠন করেছে। সভ্যতার এ অগ্রযাত্রায় কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের আবির্ভাব ঘটে যারা জীবন উৎসর্গ করে দেশ, জাতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিঃস্বার্থভাবে নিরলস কাজ করে যান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এমনই একজন মহান নেতা যার ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭১ সালে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে এক অসম লড়াইয়ে। তাঁর নেতৃত্বে ছিনিয়ে এনেছিলাম স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন এ দেশকে উন্নয়নের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে, গড়তে চেয়েছিলেন একটি ‘সোনার বাংলা’। স্বাধীনতার পর আজ বায়ান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দৃপ্ত পায়ে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের দ্বারপ্রান্তে।

২০০৯ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পিত ও ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এর ফলে ইতোমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সকল যোগ্যতা অর্জন করেছি এবং আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। গত এক দশকে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ৬.৮ শতাংশের বেশি। উচ্চ এ প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি আমরা ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়ে মূল্যস্ফীতি গড়ে ৬.৩ শতাংশের মধ্যে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশের মানুষের জীবনমান এবং ব্যবসা-বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও নীতির বাস্তবায়ন করছে এবং এ লক্ষ্যে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু তৈরি করেছি। এর ফলে আমাদের নিজস্ব সক্ষমতার ওপর গভীর আস্থা তৈরি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে শক্তি যোগাবে। রূপপুর পারমাণক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল ইত্যাদি মেগাপ্রকল্পগুলো চালু হলে দেশের অবকাঠামো খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে।

২০২০ সাল থেকে শুরু হওয়া কোভিড-১৯ অতিমারি এবং এর প্রভাব শেষ হতে না হতেই ২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সমস্ত বিশ্বে গভীর অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। একদিকে মূল্যস্ফীতির চাপ অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির গতি ধীর হয়ে যাবার ফলে সংকট ক্রমশ: ঘনীভূত হচ্ছে। রাজস্ব ও মুদ্রা নীতির সমন্বয়ে বিশ্বের দেশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও এখনও ঝুঁকি রয়ে গেছে। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিধারা আবার সঠিক পথে ফিরে এসেছে মর্মে অনুমিত হচ্ছে।

প্রতি বছরের মত এবারও আমরা সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী “মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি, ২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬” মহান জাতীয় সংসদের কাছে পেশ করছি। এ প্রতিবেদনে সরকারি অর্থ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি আশা করি এর মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এবং নীতি নির্ধারকসহ সকলে মধ্যমেয়াদে আমাদের অর্থনীতির সম্ভাব্য অবস্থা এবং দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন। আমাদের এবারের প্রকাশনাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত প্রকাশনার বিষয়বস্তু নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার ভিত্তিতে রাজস্ব ও জলবায়ু ঝুঁকিসহ নতুন কিছু বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা চিন্তার নতুন খোরাক যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

“মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি, ২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬” প্রণয়ন ও এর প্রকাশনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অর্থ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

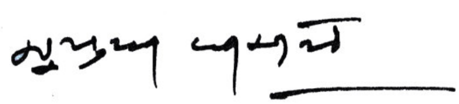

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

নীতি বিবৃতি প্রস্তুতে যারা অবদান রেখেছেন....ii
মুখবন্ধ....iii
চিত্রের তালিকা....vii
সারণির তালিকা....viii
নির্বাহী সারসংক্ষেপ....ix

প্রথম অধ্যায়ঃ পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ....১
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট....২
জাতীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট....৭
মধ্যমেয়াদি নীতি-কার্যক্রম বাস্তবায়ন....১০
অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন....১৩
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন....১৫
উন্নয়নের মূলধারায় জলবায়ু পরিবর্তন....১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প....১৯
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প....২০
প্রকৃত খাত....২০
রাজস্ব খাত....২৪
আর্থিক খাত....২৫
বহিঃখাত....২৬
উদীয়মান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা....৩০
পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (২০২৩-২৪ অর্থবছর)....৩১
২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট এবং প্রকৃত অর্জনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান....৩২

তৃতীয় অধ্যায়ঃ রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল....৩৫
রাজস্ব আদায়ে প্রবণতা ও খরচ: তুলনামূলক বিশ্লেষণ....৩৬
উৎস ভিত্তিক রাজস্ব আহরণ....৩৮
এনবিআর রাজস্বের বিভাজন....৪০
কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন....৪২
সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)....৪৩

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ ৪৪
মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল ৪৬
কর ব্যয় (tax expenditure) - বর্তমান পরিস্থিতি ৪৭
রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম ৪৯

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সরকারি ব্যয়, খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ৫৫
সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র ৫৬
সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প ৫৭
আবর্তক ও মূলধন ব্যয় ৫৭
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ৬৫
ঘাটতি অর্থায়ন এবং টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা ৭৩
ঘাটতি অর্থায়ন ৭৪
ঋণ প্রোফাইল ৭৭
ঋণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ ৭৮
ঋণ ধারণ সক্ষমতা ৭৯
বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি ৭৯
বৈদেশিক ঋণের মুদ্রা মিশ্রণ ৮০
প্রচ্ছন্ন দায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের দায় ৮১
সংস্কার এবং স্বচ্ছতা ৮১

পঞ্চম অধ্যায়ঃ আর্থিক ঝুঁকি ও প্রশমন কৌশল ৮৩
বাংলাদেশ এর ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকির উৎস ৮৪
ব্যয় সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ৮৪
রাজস্ব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ৯০
অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকি ৯১
সমাধানে করণীয় ৯২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যস্ফীতির হার ৩
চিত্র ২: বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতির হার........ ৩
চিত্র ৩: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার........৪
চিত্র ৪: বিভিন্ন দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার........৪
চিত্র ৫: রাজস্ব আহরণ (জিডিপি শতাংশে) ৫
চিত্র ৬: সরকারি ব্যয় (জিডিপি শতাংশে) ৬
চিত্র ৭: বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি রেট........ ৭
চিত্র ৮: বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচক........ ৮
চিত্র ৯: মাসিক NEER এবং REER ইনডেক্স........১৪
চিত্র ১০: জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ) ২১
চিত্র ১১: ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি (শতাংশ)........ ২৩
চিত্র ১২: প্রবাস আয়ের গতিধারা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ২৮
চিত্র ১৩: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ২৯
চিত্র ১৪: রাজস্ব আহরণের খরচ (২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১)........ ৩৭
চিত্র ১৫: বিভিন্ন দেশে প্রতি ১০০ টাকা কর আদায়ের খরচ ৩৮
চিত্র ১৬: রাজস্ব আহরণের গতিধারা (জিডিপি'র %)........ ৩৯
চিত্র ১৭: এনবিআর কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির চিত্র (%)........৪১
চিত্র ১৮: জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয় (২০২২, শতকরা হার) ৫৬
চিত্র ১৯: মোট সরকারি ব্যয়ের (জিডিপির শতকরা হারে) ৫৭
চিত্র ২০: আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপির %) ৬০
চিত্র ২১: বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের %)........ ৬০
চিত্র ২২: সুদ-ব্যয় (মোট ব্যয়ের শতকরা হার) ৬৪
চিত্র ২৩: বিভিন্ন উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন (অর্থবছর ২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬)........ ৭৫
চিত্র ২৪: অন্তর্নিহিত সুদের হার (%) ৭৬
চিত্র ২৫: সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাত........ ৭৮
চিত্র ২৬: বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি ৮০
চিত্র ২৭: বৈদেশিক ঋণের মুদ্রা মিশ্রণ........ ৮০
চিত্র ২৮: সরকারের রাজস্ব আদায় (বিলিয়ন টাকা) ৮৫
চিত্র ২৯: ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু বাজেট (তাদের মোট বাজেটের %) ৮৭
চিত্র ৩০: বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে সরকারি ও সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পরিস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)........ ৮৯

সারণির তালিকা

সারণি ১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় মূল লক্ষ্য ১৩
সারণি ২: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান........ ২০
সারণি ৩: জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি........ ২১
সারণি ৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা এবং অর্জিত/ প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা) ২২
সারণি ৫: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬) ৩৪
সারণি ৬: এশিয়ার কয়েকটি দেশে রাজস্ব আদায়ে কর-জিডিপি হারের তুলনামুলক চিত্র (কর-জিডিপির শতাংশে) .. ৩৬
সারণি ৭: রাজস্ব আহরণ চিত্র (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর, বিলিয়ন টাকা) ৩৮
সারণি ৮: রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৪০
সারণি ৯: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা) ৪১
সারণি ১০: কর বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)........ ৪২
সারণি ১১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২২-২৩ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা) ৪৩
সারণি ১২: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা) ৪৫
সারণি ১৩: রাজস্ব স্থিতিস্থাপকতা এবং বয়েন্সি (BUOYANCY)........ ৪৬
সারণি ১৪: সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের শতকরা হারে) ৫৮
সারণি ১৫: সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপির %)........ ৫৯
সারণি ১৬: পণ্য ও পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয়........ ৬১
সারণি ১৭: নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা) ৬২
সারণি ১৮: রাজস্ব প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা)........ ৬৩
সারণি ১৯: মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে) ৬৪
সারণি ২০: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকা)........ ৬৫
সারণি ২১: খাতভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যয় (২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬)........ ৭৩
সারণি ২২: বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬) (বিলিয়ন টাকা)........ ৭৪
সারণি ২৩: সুদ ব্যয় (বিলিয়ন টাকা) ৭৬
সারণি ২৪: ঋণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা) ৭৯

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০২২ সালের শুরুতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলে জ্বালানি, সার, গম ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দাম বিশ্ব বাজারে দ্রুত বাড়তে শুরু করে এবং দেখা দেয় ব্যাপক মূল্যস্ফীতি। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো কঠোর মুদ্রানীতি অবলম্বন করতে শুরু করে। কিন্তু এর ফলে বিশ্ব অর্থ বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হবার পাশাপাশি অন্যান্য প্রায় সকল দেশের মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে কমতে শুরু করে। ফলে আমদানি হয়ে পড়ে আরও ব্যয়বহুল এবং পরিণামে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে আরও কঠিন। জুন ২০২২ এর পর থেকে রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে সার, জ্বালানি ও গমের সরবরাহ অব্যাহত থাকলে, বিশ্ব বাজারে এসকল পণ্যের দাম কমতে শুরু করে এবং মূল্যস্ফীতি ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করে। তবে বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা এখনও সম্ভব না হলেও মধ্যমেয়াদে ধীরে ধীরে কমে আসবে।

মূল্যস্ফীতির চাপ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের ওপর কিছুটা চাপ তৈরি হয়েছে। ফলে যদিও ২০২২ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ যাবত কালের সর্বোচ্চ ৪৮.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়, এ চাপ মোকাবিলা করতে গিয়ে পরবর্তীতে তা কমতে শুরু করে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান ধরে রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করতে শুরু করলে রিজার্ভের পরিমাণ কমে যাবার হার আরও বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং প্রবাস আয় উৎসাহিত করার মত বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে সরকার গ্রহণ করেছে যার ফলে আগামীতে রিজার্ভে স্বস্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে।

চলমান বৈশ্বিক অস্থিরতা এবং অতিমারির পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং এ সময়ে অর্থনীতি ছিল বেশ গতিশীল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় এবং সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফলে এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। গত দেড় দশকে ২০০৮-০৯ এর মন্দা, ২০২০ সালে শুরু হওয়া অতিমারি এবং চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ইত্যাদি সংকট মোকাবিলা করে বাংলাদেশ উন্নয়নের গতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এ থেকে অনুমিত হয় যে এ দেশের একটি অন্তর্নিহিত ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি রয়েছে। এ সকল বিবেচনায় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছর নাগাদ ৮ শতাংশে পৌঁছাবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হবে শক্তিশালী ভৌত অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহের নিশ্চয়তা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে মাথায় রেখে দক্ষতা উন্নয়ন। এ লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত করছে।

সরকারি কার্যক্রম ও সেবা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তৃতি বাড়াতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বর্তমানে আহরিত রাজস্বের ৮৭ শতাংশের বেশি অর্জিত হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রগুলো থেকে। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্রগুলো থেকে কর আদায়ের হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল অনলাইনে কর রিটার্ন প্রদানের ব্যবস্থা প্রণয়ন, সারা দেশে কর আদায় উৎসাহিত করতে প্রতি বছর কর মেলার আয়োজন, অধিক সংখ্যক ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস বসিয়ে ভ্যাট আদায়ের হার বৃদ্ধির উদ্যোগ, কর সংক্রান্ত আইনের যুগোপযোগী সংস্কার এবং কর আদায়ের সকল স্তর ও প্রক্রিয়ায় যথাসম্ভব ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ। আশা করা হচ্ছে এসকল উদ্যোগের ফলে মধ্যমেয়াদে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কর আদায় বৃদ্ধি পাবে।

ঋণ পরিশোধে যে কোন সমস্যা এড়াতে সরকার অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা ৫ শতাংশের কাছাকাছি ধরে রেখে প্রতি বছর ঘাটতি অর্থায়নের পরিকল্পনা করে থাকে। এর ফলে বাংলাদেশের মোট ঋণের পরিমাণ আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার অনেক নীচে রয়েছে এবং বাংলাদেশকে ''নিম্ন ঝুঁকি''-র দেশের তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে এ সত্ত্বেও সরকার যে সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি রয়েছে সে দিকে তীক্ষ্ন নজর রাখছে। বিশেষ করে রাজস্ব খাতের এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন এবং কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখা এবং জোরদার করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন বৈশ্বিক সংকট কাটিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং প্রবৃদ্ধির হার বজায় থাকায় এখন সমস্ত বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। একটি বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী, রপ্তানি বাজারের ক্রমাগত সম্প্রসারণ, প্রবাস আয়ের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি এবং সামষ্টিক ও সামাজিক খাতের অর্জন অব্যাহত থাকায় গত দেড় দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে এবং আগামীতে এ দেশের পরিশ্রমী ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশে পরিণত করবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষাপট তুলে ধরতে এ নীতি বিবৃতিকে পাঁচটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বর্তমান বৈশ্বিক ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি নীতি ও পরিকল্পনাসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি প্রাক্কলনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করে চতুর্থ অধ্যায়ে সরকারের মধ্যমেয়াদি অগ্রাধিকারসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

১.১ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন বিবেচনায় বিগত ১৪ বছর ছিল বাংলাদেশের জন্য এক বড় ধরনের উত্তরণের যুগ। ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সূচক, বিশেষ করে, গড় আয়ু, সাক্ষরতার হার, মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন, ক্যালোরি গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের ফলে দারিদ্র্য যেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে তেমনি টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে মাথাপিছু আয়ভিত্তিক বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ রূপান্তরের স্বপ্ন দেখছে।

১.২ ২০০৯ থেকে ২০২২ সময়ের প্রথম দশ বছরে দেশে ৬.৩৩ শতাংশ হারে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়, যা পরবর্তীতে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭.৮৮ শতাংশে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ খানা জরিপ অনুসারে আবাসিক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ২০২১ সালের মাত্র ৫৫.৩ শতাংশ হতে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৯৯.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তদুর্ধ্ব) ২০১০ সালের ৫৭.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৭৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পরিবার প্রতি মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালের ১১ হাজার ৪৭৯ টাকা হতে ২০২২ সালে ৩২ হাজার ৪২২ টাকায় উন্নীত হয়েছে। Head Count Ratio (HCR) অনুসারে ২০২২ সালে দেশের ১৮.৭ শতাংশ মানুষ উচ্চ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৩১.৫ শতাংশ। শহর ও গ্রাম এলাকার দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের যথাক্রমে ২১.৩ ও ৩৫.২ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০২২ সালে যথাক্রমে ১৪.৭ ও ২০.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

১.৩ গত এক দশকে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ সময় বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। তবে, রাজস্ব ও আর্থিক খাতে বিভিন্ন

সময়োপযোগী এবং কার্যকর প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ ও এ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার বিরূপ প্রভাব সফলভাবে মোকাবিলা করেছে এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কোভিডের সংক্রমণ ও মৃত্যুহার ছিল খুবই কম এবং টিকা প্রদানের হারও ছিল অনেক বেশি। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি সফলভাবে ঘুরে দাঁড়ায় যার ফলশ্রুতিতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৩.৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় পরবর্তী দুই অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি অর্জনকে 'V Shaped Recovery' এর সাথে তুলনা করা যায়। তবে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা ২০২২ সালের প্রথমার্ধ থেকে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে। ফলে, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি, খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। এতে দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে, মুদ্রার অবচিতি ঘটেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সরকার মধ্যমেয়াদি ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার পাশাপাশি এমন একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করেছে, যা দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে, মুল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখবে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

১.৪ উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে সরকার মধ্যমেয়াদে যে সকল সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি কৌশল অবলম্বন করবে তা এ নীতি বিবৃতিতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট পরিকল্পনা এবং ২০২৪-২৫ ও ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বিভিন্ন প্রক্ষেপণ এ নীতি বিবৃতিতে উল্লিখিত নীতিসমূহেরই প্রতিফলন।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.৫ কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতি একটি মাঝারি প্রবৃদ্ধি ও তুলনামূলক স্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। অঞ্চলভেদে তারতম্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অর্থনৈতিক সূচকগুলো ইতিবাচক ধারার মধ্য দিয়েই যাচ্ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ছিল, বিশেষ করে, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ধারা ছিল বেগবান। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মত উন্নত দেশগুলিতেও পরিমিত প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারি ও চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যুগপৎ প্রভাব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ ধারাকে ব্যাহত করেছে। বিগত বছরে তেল ও খাদ্য বাজারে যোগান ঘাটতি ও অপ্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি বড় ধাক্কা দিয়েছে। আইএমএফ-এর হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক পণ্যসমূহের ভারিত সূচক ২০২১ সালের মার্চ মাসের ১৪০.৯ হতে ২০২২ সালের মার্চ-এ দাঁড়ায় ২৩৮.৯। এছাড়া, ২০২২ সালের আগস্ট মাসে জ্বালানি পণ্যগুলোর জন্য ভারিত সূচক ছিল ৩৭৬.৪, যা পূর্বের বছর একই সময়ে ছিল মাত্র ১৮৩.৮। উন্নত দেশগুলির সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ শতাংশ অতিক্রম করে, যা ২০২০ সালের ১.০ শতাংশের চেয়েও কম ছিল। ইউরো এলাকার দেশগুলিতে ২০২০ সালে

মূল্যস্ফীতির হার ছিল ০.২৫ শতাংশ, যা ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮.৩৮ শতাংশে। উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলিতে মূল্যস্ফীতি ২০২০ সালে ৫.১৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৯.৮১ শতাংশে দাঁড়ায়। তবে, এশিয়ার উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরবর্তী সময়েও মূল্যস্ফীতির হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। এ সকল দেশে মূল্যস্ফীতির হার ২০২০ সালের ৩.১৯ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮২ শতাংশ হয়।

চিত্র ১: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যস্ফীতির হার

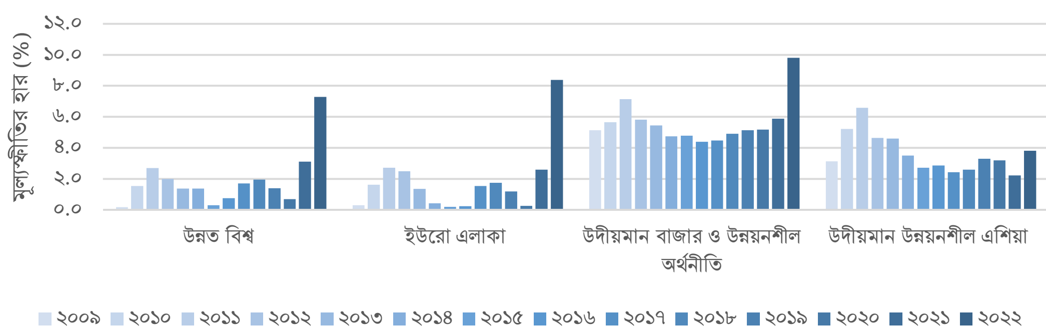

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০২৩), আইএমএফ

চিত্র ২: বিভিন্ন দেশের মূল্যস্ফীতির হার

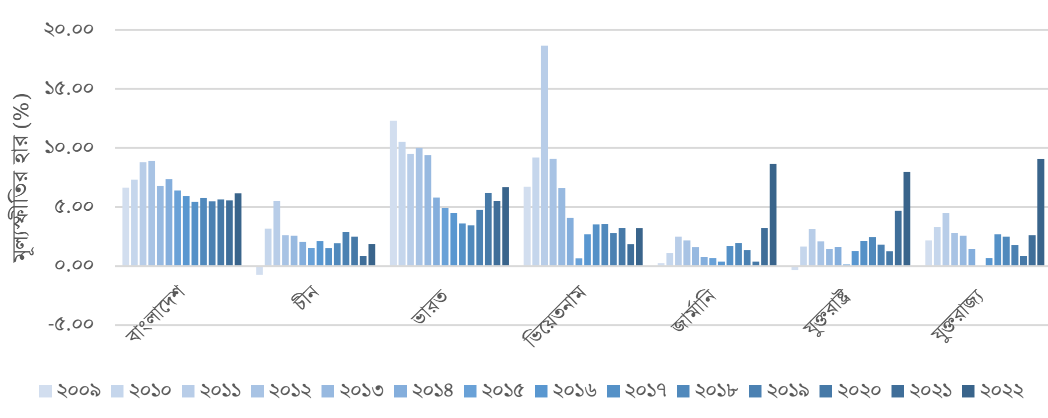

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০২৩), আইএমএফ

১.৬ বিগত কয়েক বছরের সংকটসমূহের প্রভাব বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শ্লথ করেছে। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ৩.৩০ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন অতিমারি-সৃষ্ট মন্দা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনায় নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক অনুযায়ী ২০২৩ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৮ শতাংশ, যা ২০২১ সালে প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৬.৩ শতাংশ এবং ২০২২ সালে প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৩.৪ শতাংশ। আইএমএফ'র প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোর প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে বেশি। যদিও অঞ্চলভেদে এ সম্ভাবনায় বেশ তারতম্য রয়েছে।

চিত্র ৩: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

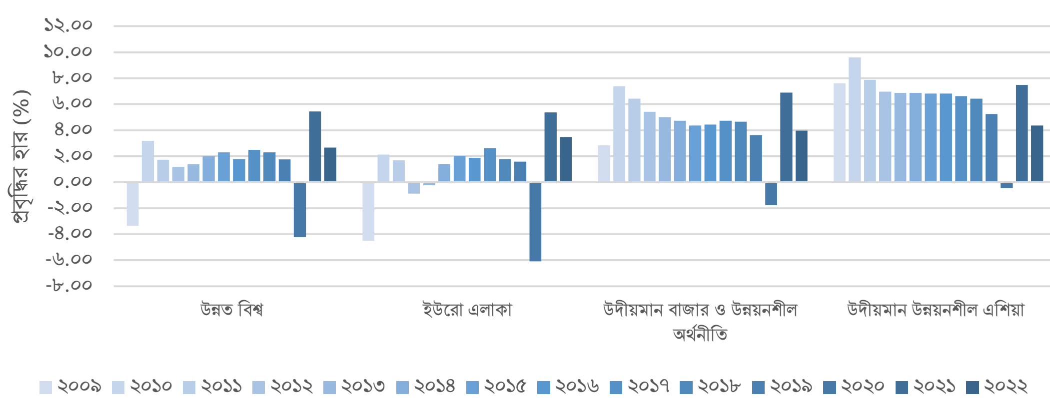

চিত্র ৪: বিভিন্ন দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

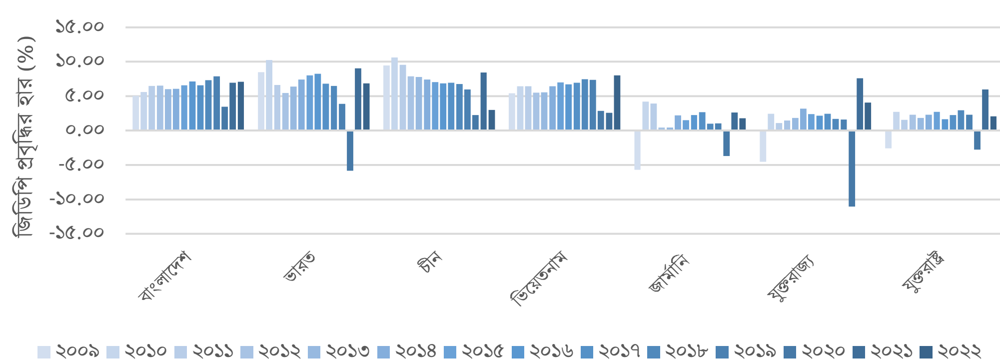

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০২৩), আইএমএফ

১.৭ উচ্চ ও অনিশ্চিত মূল্যস্ফীতির কারণে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ক্রমশ: জটিল হয়ে উঠছে, যার ফলে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও রাজস্ব খাতের কার্যক্রমে স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পণ্য মূল্য, মজুরির হার ও সুদের হারের বিদ্যমান অনিশ্চয়তা সামগ্রিক চাহিদা ও প্রত্যাশার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতিকে প্রভাবিত করছে, যা প্রকারান্তরে রাজস্ব পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। উদহারণস্বরূপ বলা যায় আইএমএফ কর্তৃক ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত ফিসক্যাল মনিটর প্রতিবেদন অনুযায়ী মূলত খাদ্য ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জন্য উচ্চ ব্যয়ের কারণে উন্নত ও নিম্ন-আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২২ সালে বড় আকারের বাজেট ঘাটতি হয়েছে। অন্যদিকে, উদীয়মান বাজার অর্থনীতির দেশগুলিতে বাজেট ঘাটতির কারণ ছিল রাজস্ব আদায় কার্যক্রমে মন্থর গতি। বাংলাদেশেও অতিমারির সময় সরকার কর্তৃক ব্যক্তি ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সহায়তা কর্মসূচি ও প্রণোদনা প্যাকেজ দেয়া হয়, যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। অধিকন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। যুদ্ধের কারণে পণ্য ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়, সরবরাহে ঘাটতি ও মুদ্রা বিনিময় হারের অবচিতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে, অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হয় বিধায় সরকারকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর হ্রাসসহ বিশেষ কর ছাড় দিতে হয়। এতে সরকারের রাজস্ব আদায় অনেক হ্রাস পায়। উল্লেখ্য যে, অর্থনীতির বহুমুখীতা ও সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থাকায় অনেক উন্নত অর্থনীতির দেশের জন্য সংকট থেকে উত্তরণ সহজতর হয়। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন 'গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট' অনুযায়ী বাজেট ঘাটতি ৩ শতাংশের বেশি এরূপ দেশসমূহে মুদ্রার অবচিতি অন্যান্য উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির তুলনায় ৮ গুণেরও বেশি হয়েছে।

চিত্র ৫: রাজস্ব আহরণ (জিডিপির শতাংশে)

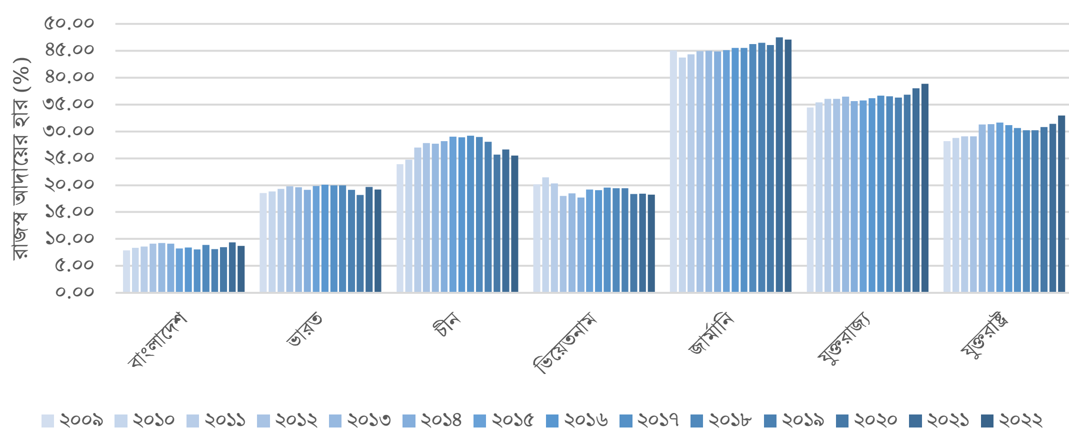

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০২৩), আইএমএফ

চিত্র ৬: সরকারি ব্যয় (জিডিপির শতাংশে)

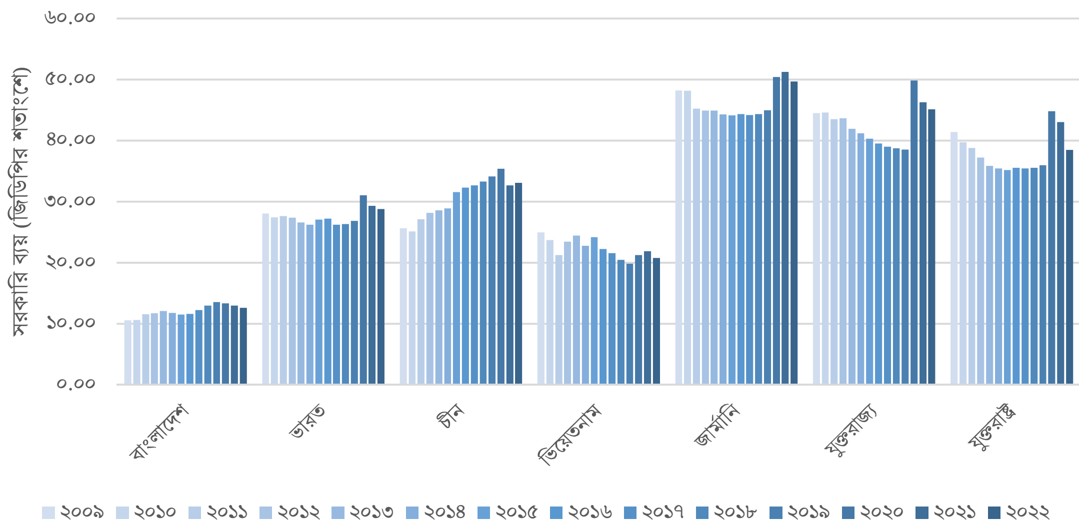

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (এপ্রিল ২০২৩), আইএমএফ-এর ডাটাবেজ

১.৮ ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ বজায় ছিল। এ সময়ে সুদের হার ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম, বাজারে অস্থিরতাও খুব বেশি ছিল না এবং তারল্যও অনেক ছিল। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং পূর্ব ইউরোপে চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকি আরো ঘনীভূত করেছে। তারল্য সংকটের মধ্যে আকস্মিক সংকোচনমূলক মুদ্রা নীতি যোগ হওয়ায় ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, ক্রমবর্ধমান সুদের হার, ভঙ্গুর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অর্থ পাচারের সমন্বিত প্রভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ঋণের ব্যয়কে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা খেলাপী ঋণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক ও সিগনেচার ব্যাংক এবং ইউরোপের The Credit Suisse এর পতন বিদ্যমান অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্বালানি আমদানিনির্ভর দুর্বল ক্রেডিট রেটিংস-এর দেশগুলোতে সুদের হার বৃদ্ধির প্রভাব অধিকতর দৃশ্যমান হচ্ছে। এ দেশসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা আরো চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।

১.৯ ক্রমাগত উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিশ্বের অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে দ্রুততর সময়ে সংকোচনশীল মুদ্রানীতি গ্রহণ করেছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি সরকারি বন্ডের সুদের হার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ২০০৭ সালের পর সর্বোচ্চ এবং জার্মানীর ক্ষেত্রে ২০১১ সালের পর সর্বোচ্চ হয়েছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ২০২২ সাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েকবার সুদের হার বৃদ্ধি করেছে। যুক্তরাজ্যের পেনশন ফান্ডসমূহ যে সকল ডেরিভেটিভ ইনস্ট্রুমেন্ট ধারন করে সেগুলোর বিপরীতে জামানত হিসেবে সম্পদের মূল্যমান কমে যাওয়ার পরিপেক্ষিতে ঋণগ্রহীতাদেরকে পুনরায় অতিরিক্ত জামানত দিতে বলায় বাজারে দ্রুত তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয়

ব্যাংককে বাজারে আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য সরকারি বন্ড বা গিল্ট মার্কেটে হস্তক্ষেপ করতে হয়। একই সময়ে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ব্যাংক রেট বৃদ্ধি করে ৪.২৫ শতাংশে উন্নীত করে যা ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ছিল মাত্র ০.১ শতাংশ। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহের এরূপ সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি উদীয়মান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূলধন প্রবাহে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ২০২১ সালের শুরু থেকেই উদীয়মান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থায়ন ও ইক্যুইটি প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছিল। এর পাশাপাশি, ২০২২ সালে মার্কিন ডলারের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে অধিকাংশ উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মুদ্রার অবচয় ঘটেছে।

চিত্র ৭: বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পলিসি রেট

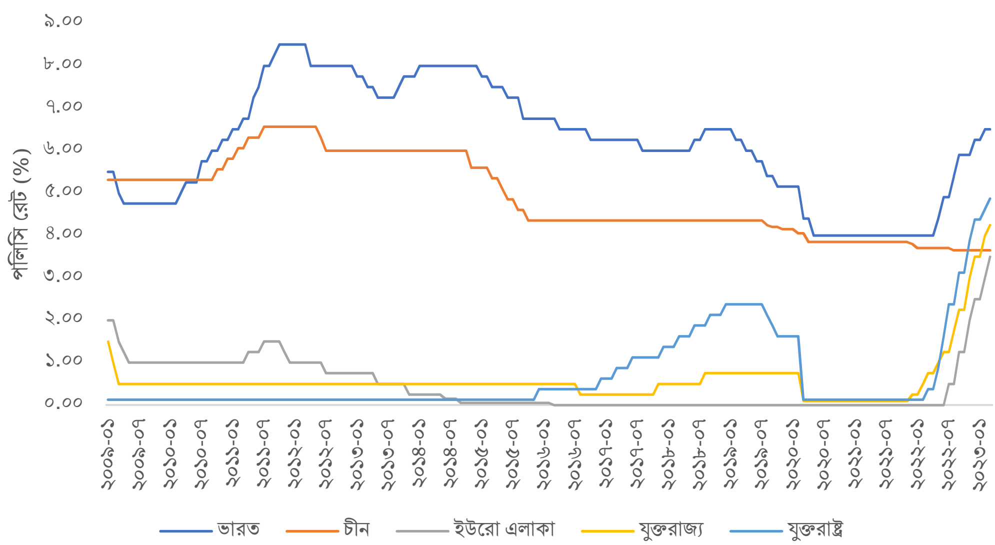

সূত্রঃ ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট

জাতীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

১.১০ কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির গতিপথে ছিল এবং বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এ সময় দেশের অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। ২০১৯-২০ অর্থবছর ব্যতীত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার কখনো ৫ শতাংশের কম হয়নি। এ সময়ে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ শতাংশের কম, যদিও ২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে এ হার ছিল গড়ে ৭.৬৩ শতাংশ। ঐতিহাসিকভাবে সরকারের রাজস্ব আয় জিডিপি’র শতকরা হিসেবে দুই অংকের নীচে থাকলেও সরকারের ব্যয় ধারাবাহিকভাবে দুই অংকে

অবস্থান করে। ২০০৮-০৯ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারের ব্যয় ছিল গড়ে জিডিপি'র ১২ শতাংশের বেশি। এ সময়কালে চলতি হিসাব ভারসাম্য বেশ ওঠা-নামা করেছে, যা অর্থের অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে। এক পর্যায়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্য জিডিপি'র -৪.০৬ শতাংশে নেমে আসে।

চিত্র ৮: বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন সূচক

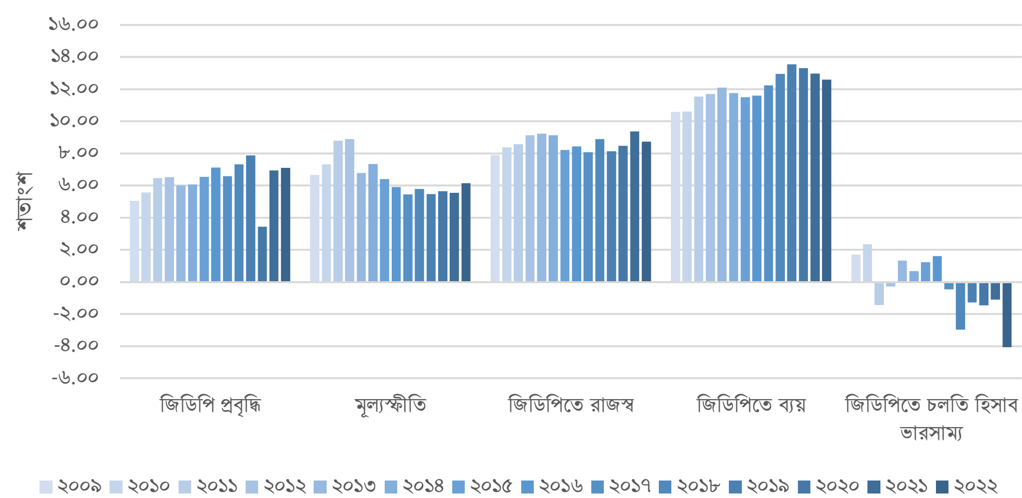

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

১.১১ উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পাশাপাশি ঐ সব দেশে উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির ফলে সামগ্রিক চাহিদা কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ও মুদ্রার অবচিতির কারণে আমদানি ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি এবং জাতীয়ভাবে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৩৩ শতাংশে, যা ২০২২ সালের মার্চ ও ২০২০ সালের মার্চে ছিল যথাক্রমে ৬.২২ ও ৫.৪৮ শতাংশ।

১.১২ ২০২২ সালে আমদানি শুল্ক কমানোসহ অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর কমানোর পরেও বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সংকটের কারণে চালের দাম বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি কিছু দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে চিনির দামও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গমের মূল্যও বেড়ে যায়। ভোজ্য তেল রপ্তানিকারক দেশগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় ভোজ্য তেলের দামও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর হ্রাসের ফলে রাজস্ব ঘাটতি বাড়ে। রাজস্ব ঘাটতি মেটানোর জন্য দেশীয় ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ

বেড়ে যায়। এ সময়ে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মুদ্রার অবচিতির কারণে নিট বৈদেশিক অর্থায়ন হ্রাস পায়। এর পাশাপাশি ভর্তুকি, প্রণোদনা ও নগদ সহায়তা ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় চলতি ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে, বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে ভর্তুকি ও হস্তান্তরজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অতিমারি পরবর্তী পুনরূদ্ধার কার্যক্রম দ্রুততর করার উপযোগী বার্ষিক ব্যয় পরিকল্পনা আনয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে।

১.১৩ আমদানিকৃত সকল পণ্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যবর্তী পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বর্ধিত আমদানির কারণে আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়কে ছাড়িয়ে যায়। একইসাথে কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্থর গতির কারণে রেমিট্যান্সের প্রবাহ অনেক কমে যায়। সার্বিকভাবে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। এতে বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের ৯.৩ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৫.৩ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ৩১.১৪ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে, এক বছর আগে যার পরিমাণ ছিল ৪৪.১৭ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবহার করায় ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

১.১৪ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৈশ্বিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি অভিঘাত-সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। দেশের অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ওপর মহামারির প্রভাব কমানোর জন্য সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতিসমুহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক নীতি গ্রহণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাসের পর পুনরায় উচ্চতর প্রবৃদ্ধি হতে থাকে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ প্রবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে সেবা খাতের সম্প্রসারণ এবং বর্ধিত বৈদেশিক চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেবা খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৯ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৫.৭ শতাংশে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬.২৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল কারণ এ সময়ে রপ্তানি গন্তব্যের প্রধান প্রধান দেশগুলির অর্থনীতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছিল। এ অর্থবছরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৩.৪ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছরের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১২.৪ শতাংশের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এর পাশাপাশি অতিমারিকালীন উৎপাদন পর্যায়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বেশি পরিমাণে আমদানি করতে থাকায় দেশে আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানির পরিমাণ ৩৫.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.১৫ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করার স্বার্থে রাজস্ব খাত ও মুদ্রা খাতের সমন্বয় সরকারের নীতি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হয়েছে। অনেক উন্নত ও উদীয়মান অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি যেমন বেড়েছে সেরূপ বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। তাই দেখা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৬ শতাংশ তা ২০২১-২২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৬.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান অর্থবছরেও একটি ঊর্ধ্বমুখী ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি থেকে কিছুটা সরে এসে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদিও বিনিয়োগে প্রবৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করে আসছিল যা ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষ প্রান্তিক পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কিছু বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ২০২২ সালের মে মাস থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত চার বার রেপো রেট বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে রেপো রেট ১২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিভার্স রেপো রেট ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে, যদিও শিল্প খাতে ঋণের জন্য ৯ শতাংশ সুদের হারের যে সিলিং ছিল তা অপরিবর্তিত রয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে জারী করা মুদ্রা নীতি বিবৃতিতে ঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ সুদের হার সংশোধন করা হয়েছে। কনজিউমার ক্রেডিটের জন্য এ হার ১২ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে এবং ক্রেডিট কার্ডের ঋণের সর্বোচ্চ সুদের সিলিং বাদ দেয়া হয়েছে।

মধ্যমেয়াদি নীতি-কার্যক্রম বাস্তবায়ন

১.১৬ বৈশ্বিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে যে সকল সাময়িক নীতি-কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার পাশাপাশি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করা এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার বেশ কিছু মধ্যমেয়াদি সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এসব সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণের খরচ কমানো, ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ এবং সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের মাধ্যমে ব্যয়ের গুণগত মানোন্নয়ন। সংস্কার কার্যক্রমের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো বহিঃখাতে লেনদেনের ভারসাম্য শক্তিশালী করা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্গঠন করার পাশাপাশি চাহিদা এবং আমদানি নিরুৎসাহিতকরণের উদ্দেশ্যে যে সকল সাময়িক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে তুলে নেয়া। এর আওতায়, বাজেট ঘাটতি এবং সরকারি ঋণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত রাখার মাধ্যমে টেকসই সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। ব্যয় ব্যবস্থাপনার উত্তম চর্চাসমূহের অনুসরণের মধ্য দিয়ে এবং অগ্রাধিকার খাত যেমন সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিনিয়োগ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এসকল সংস্কারের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা হবে।

১.১৭ মধ্যমেয়াদে সরকার সতর্ক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করবে; এক্ষেত্রে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ (প্রাথমিক এবং সার্বিক- উভয় ধরনের), ঘাটতি অর্থায়নের গঠন, এবং সরকারি ও সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিকৃত মোট ঋণের পরিমাণের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে। মধ্যমেয়াদে সরকারের মূল কৌশল হবে বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) জিডিপি'র ৩.৩ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা যাতে ঋণ ও জিডিপি'র

অনুপাত ৪৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ানোর পাশাপাশি ভর্তুকি এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের ব্যয় যৌক্তিকীকরণে সরকার উদ্যোগী হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার ইতোপূর্বে যে সকল সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যেমন: সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, কর্মসূচির ব্যাপ্তি যৌক্তিকীকরণ, জিটুপি পদ্ধতির ব্যবহার, সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু ইত্যাদি মধ্যমেয়াদে চালু থাকবে।

১.১৮ বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত অনেক দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। রাজস্ব আদায়ের হার কম হওয়ায় তা গুরুত্বপূর্ণ খাতে বাজেট বরাদ্দ সম্প্রসারণ এবং প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে। তাই, সরকার উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করে আয়কর এবং ভ্যাট ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার শুরু করেছে। নীতি সংস্কারের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- কর আইন আধুনিকীকরণ, কর ব্যয় যৌক্তিকীকরণ, কর হার কাঠামো সহজিকরণ, এবং করের ভার বাণিজ্য-সম্পর্কিত খাত হতে সরিয়ে আয় এবং মূল্য সংযোজনের দিকে স্থানান্তরিত করা। রাজস্ব প্রশাসনের মূল সংস্কারের মধ্যে রয়েছে- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কমপ্লায়েন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপন এবং পরিপালন জোরদারকরণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, এনবিআর -এর বিভিন্ন অনুবিভাগ যেমন- আয়কর, ভ্যাট ও কাস্টমস -এর মধ্যে তথ্য শেয়ারিং জোরদার করা, কর প্রশাসনে অটোমেশন ব্যবস্থা জোরদার ও সমন্বয় করা, এবং উৎসে কর সংগ্রহ বৃদ্ধি, ইত্যাদি। এসব সংস্কারের ফলে আশা করা যায় যে, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত ০.৫ শতাংশ করে বাড়বে যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ০.৭ শতাংশে দাঁড়াবে।

১.১৯ সরকার জ্বালানি ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণসহ সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক দামের সাথে সামঞ্জস্য রাখা এবং ভর্তুকির পরিমাণ কমানোর উদ্দেশ্যে ২০২২ সালের আগস্টে পেট্রোলিয়ামের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি পদ্ধতিগত ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে সরকার পর্যায়ক্রমিক সূত্র-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় জ্বালানি মূল্য সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু করতে যাচ্ছে, যা পেট্রোলিয়াম পণ্যে ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তা দূর করবে বলে আশা করা হচ্ছে। অধিকন্তু, সরকার সামগ্রিক রাজস্ব বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কর-রাজস্ব খাতে নতুন নতুন ক্ষেত্র করের আওতায় আনার কাজে মনোনিবেশ করছে এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎসগুলিতেও জোর দিচ্ছে। সুদ পরিশোধ বাবদ সরকারের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার হ্রাস, স্তরযুক্ত সুদের হার প্রবর্তন, বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, এবং অর্জিত সুদের ওপর কর বৃদ্ধিসহ বেশ কয়েকটি সংস্কার পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে, সরকারি নিট ঋণে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের অবদান ছিল জিডিপি'র ০.৫ শতাংশ, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১.২ শতাংশ। সুদ বাবদ ব্যয় কমিয়ে সরকারি অর্থের সাশ্রয় করার ক্ষেত্রে দক্ষ নগদ ব্যবস্থাপনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সরকার ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট (TSA) -এর ব্যবহার ও আওতা বাড়াচ্ছে যাতে নগদ ব্যবস্থাপনায় আরো দক্ষতা অর্জিত হয়, সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাস পায় এবং কমিটমেন্ট ব্যবস্থাপনায় আরো উন্নতি আসে।

১.২০ বহিঃখাতে ভারসাম্য শক্তিশালীকরণ এবং মুদ্রা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মধ্যমেয়াদে বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। এসময় একাধিক মুদ্রা বিনিময় হারের স্থলে একক বিনিময় হার চালুকরণসহ বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে এবং সার্বিকভাবে আর্থিক খাতে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অনাবশ্যকীয় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে বর্ধিত এলসি মার্জিনের যে শর্ত আরোপিত হয়েছে তা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যাহার করে নেবে।

বক্স ১: মধ্যমেয়াদি সংস্কার কর্মসূচি

বর্তমান সংকট মোকাবিলা এবং ঘাতসহনশীল অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যা মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখযোগ্য সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে:

- **রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি:** রাজস্ব আয়ে গতি আনার লক্ষ্যে কর নীতি এবং রাজস্ব প্রশাসনে যুগপৎ সংস্কার সাধন করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ জিডিপি'র শতাংশে বর্তমান পর্যায় হতে ১.৭ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণের পাশাপাশি সরকারি ঋণের ব্যয় হ্রাস এবং সার্বিকভাবে ঋণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে সঞ্চয়পত্র হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে গৃহীত মোট ঋণের এক চতুর্থাংশের মধ্যে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। ক্যাশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ট্রেজারি সিঙ্গেল একাউন্টের (টিএসএ) আওতা বৃদ্ধি এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) -এর ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে।
- **মুদ্রা ও বহিঃখাত ব্যবস্থাপনা:** মুদ্রা খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশে ব্যাংক করিডোর সিস্টেম সুদহার চালু করবে। অধিকন্তু, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারে ফ্লেক্সিবিলিটি আনার লক্ষ্যে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বৈদেশিক মুদ্রার অফিসিয়াল লেনদেনের ক্ষেত্রেও বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবহার করা হবে।
- **আর্থিক খাতের পরিচালন:** আর্থিক খাতে ঝুঁকি-ভিত্তিক ব্যাংক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পাইলট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। তাছাড়া, আর্থিক খাতে সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক উত্তম চর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকার ব্যাংক কোম্পানি আইন এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন সংশোধন করবে। অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক ফিন্যান্সিয়াল স্টাবিলিটি রিপোর্টে ব্যাংকসমূহের মন্দ সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করবে।
- **জাতীয় আয়ের হিসাব:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জিডিপি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.২১ মধ্যমেয়াদে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলে থাকবে অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। এ পরিকল্পনার প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো: করোনা অতিমারি হতে দ্রুত পুনরূদ্ধারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, আস্থা, কর্মসংস্থান, আয়, এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনয়ন; জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান তৈরি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন; উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিকের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং এর সুফল ভোগের সুযোগ সৃষ্টিসহ দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণ; দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষম একটি টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ; প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার; অনিবার্য নগরায়ন প্রক্রিয়ার সফল ব্যবস্থাপনা; উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও মানোন্নয়ন; এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রভাব মোকাবিলা ও এসডিজি লক্ষ্যসমূহ অর্জন। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫১ শতাংশে পৌঁছাবে। এসময় বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে জিডিপি'র ৩৬.৫৯ শতাংশ যার মধ্যে বেসরকারি খাত হতে আসবে জিডিপি'র ২৭.৩৫ শতাংশ।

সারণি ১: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় মূল লক্ষ্য

সূচক	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	৭.৪০	৭.৭০	৮.০০	৮.৩২	৮.৫১
সিপিআই মূল্যস্ফীতি (শতাংশ)	৫.৯০	৪.৯০	৪.৮০	৪.৭০	৪.৬০
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা. ডলার)	২১৭০	২৩৪৫	২৫৫৫	২৭৯০	৩০৫৯
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতাংশে)	৩২.৫৬	৩২.৭৩	৩৪.০০	৩৪.৯৪	৩৬.৫৯
এডিপি ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)	১৮০০	২১৩৩	২৬২২	৩০৬০	৩৬৭৫
রপ্তানি (মিলিয়ন মা. ডলার)	৩৭৭৫৫	৪১৬৪৩	৪৫৯৯৫	৫০৮৭০	৫৬৩৩৯
আমদানি (মিলিয়ন মা. ডলার)	৫৫৭৬০	৬১৩৩৬	৬৭৭৭৬	৭৫২৩২	৮৩৮৮৩
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (মিলিয়ন মা. ডলার)	২৯৪৮	৫২৩৯	৮১৪১	১১৮৫৯	১৫৮০৮
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (রপ্তানি মাস)	৭.৭	৭.৮	৮.২	৮.৭	৯.৩
দারিদ্র্যের হার (শতাংশ)	২৩.০	২০.০	১৮.৫	১৭.০	১৫.৬

উৎস: জিইডি, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন; নোট: রপ্তানি ও আমদানি তথ্যসমূহ f.o.b. (including EPZ) হিসেবে নেয়া।

১.২২ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধিকাংশ লক্ষ্য অর্জনের পথে রয়েছে বাংলাদেশ। এমনকি কিছু কিছু সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লক্ষ্যেমাত্রার চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। যেমন: ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যার বিপরীতে প্রকৃত রপ্তানি হয়েছে ৪৯.২৫

বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রাজস্ব আহরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এডিপি বরাদ্দের যে লক্ষ্যমাত্রা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত ছিল তা অর্জিত হয়েছে। স্বাক্ষরতার হার, মাতৃমৃত্যুর হার এবং শিশু মৃত্যুর হার, বিদ্যুতায়ন, নিরাপদ পানি, ইত্যাদির মতো আর্থসামাজিক লক্ষ্য অর্জনেও বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

১.২৩ এমনকি, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কতিপয় দুরূহ লক্ষ্যমাত্রাও ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। অষ্টম পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সপ্তম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কালে বাংলাদেশের স্থানীয় মুদ্রার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (Real Effective Exchange Rate- REER) বৃদ্ধি পেয়েছে যা রপ্তানি সম্ভাবনাকে টেনে ধরেছে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করেছে। অতএব, অষ্টম পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর ফ্ল্যাক্সিবিলিটি আনয়ণের মাধ্যমে উচ্চ REER জনিত প্রভাব কাটিয়ে ভবিষ্যতেও উচ্চ REER এড়িয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সম্প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে বড় ধরনের অবনমন হওয়ায় ইতোমধ্যে অতীতে টাকার প্রকৃত বিনিময় মূল্যের অতিমূল্যায়নজনিত প্রভাব সংশোধিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার গ্রহণ করায় সামনের দিনগুলোতে REER এর ঊর্ধ্বগতি এড়ানো যাবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র ৯: মাসিক NEER এবং REER ইনডেক্স

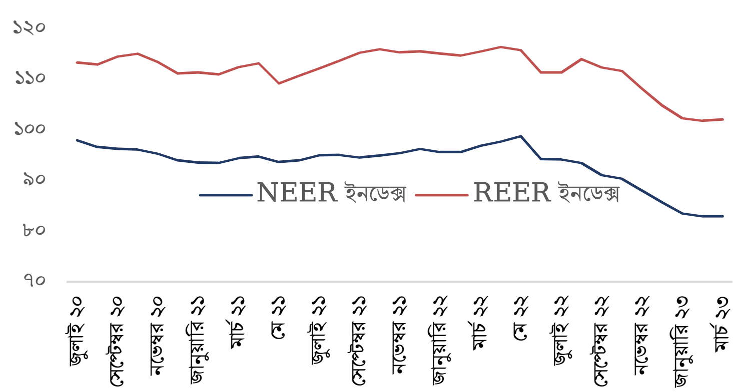

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

১.২৪ তবে, করোনা অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে এবং পরিকল্পনায় নির্ধারিত অনেক লক্ষ্য অর্জনের পথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ এমন পর্যায়ে বাড়ানোর লক্ষ্য ছিল যা ৮.২ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয়

মেটাতে পারে। এছাড়া, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা ধীরগতিতে হয়েছে। অন্যদিকে, সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির সাম্প্রতিক হার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রক্ষেপণের চেয়ে অনেক বেশি। অধিকন্তু, দেশীয় মুদ্রার তীব্র অবমূল্যায়নের কারণে, ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় (জিএনআই-মার্কিন ডলার) হ্রাস পেয়েছে। টাকার বিনিময় হারের পতন অব্যাহত থাকলে, অবশিষ্ট বছরগুলিতে মাথাপিছু আয় অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হবে।

১.২৫ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মেয়াদকালের অর্ধেকটা ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে। তাই, সরকার এ পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদি রিভিউ প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যা সরকারকে মাঝামাঝি সময়ে এসে অর্জনসমূহ পরীক্ষা করতে এবং প্রাসঙ্গিক ঝুঁকি ও অনুমানসমূহের ভিত্তিতে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে সহায়তা করবে। এ রিভিউ প্রক্রিয়ায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, রপ্তানি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, এবং দারিদ্র্য হ্রাসসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা থাকবে। পাশাপাশি এতে খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকবে। এ লক্ষ্যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০৪টি সূচকের সমন্বয়ে একটি ডেভেলপমেন্ট রেজাল্টস ফ্রেমওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

১.২৬ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন মেয়াদকালের অর্ধেকটা সময় ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। Sustainable Development Report 2022 অনুযায়ী, বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এ মূল্যায়ন অনুসারে, এসডিজি বাস্তবায়নের ভিত্তিতে ২০২২ সালে ১৬৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৪তম স্থানে রয়েছে, যেখানে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১৬তম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে গৃহীত হওয়ার পর থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া এসডিজিতে অন্য যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে বেশি অগ্রগতি করেছে; বিশেষ করে বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়া সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি দেখাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ‘সমস্ত-সমাজ (whole-of-society)’ পন্থা অবলম্বন করে এবং ‘কাউকে পিছিয়ে না রেখে (leaving no one behind)’ এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকাদের নিকট সবার আগে পৌঁছানোর উচ্চাভিলাসী লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়ে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

১.২৭ বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন (এসডিজি-১)। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারিত রয়েছে। Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022 অনুযায়ী, দারিদ্র্যের হার ইতোমধ্যে ১৮.৭ শতাংশে নেমে এসেছে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। শহরাঞ্চলে আরো কমে দারিদ্র্যের হার ১৪.৭ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্য ৩.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কোভিড অতিমারিকালীন আয় হ্রাস এবং সাম্প্রতিক উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ নানা

অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের হার ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার পরিচালিত বিভিন্ন সহায়তা প্যাকেজ এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১.২৮ এসডিজি-২ -এ ২০২৫ সালের মধ্যে অপুষ্টির হার ১২ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে যা অর্জনের পথে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৬ সালে অপুষ্টির হার ছিল ১৬.৪ শতাংশ, যা ২০১৮ সালে প্রায় ১৪.৭ শতাংশে নেমে আসে। WFP এবং WHO কর্তৃক প্রকাশিত 'Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2020' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে অপুষ্টির হার ৯.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। ক্ষীণকায় শিশুর হার ২০১৪ সালের ১৪ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ৯.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। মাতৃমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৯৫-২০২০ এর মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহারেও ক্রমাগত উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে; এ হার ২০২০ সালে প্রতি এক লাখ জীবিত জন্মে ১৬৩ -তে নেমে এসেছে যা ১৯৯৫ সালে ছিল ৪৪৭। Multiple Indicator Cluster Survey 2019 অনুসারে, প্রায় ৭৪.৫ শতাংশ শিশু স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মনো-সামাজিক সুস্থতার ট্র্যাকে উন্নতির পথে রয়েছে; এ হার ছেলে শিশুর ক্ষেত্রে ৭১.৪ শতাংশ এবং মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে ৭৮ শতাংশ।

১.২৯ অন্যান্য আর্থসামাজিক বিষয়েও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে ২০২২ সালে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৭১তম স্থানে রয়েছে, যেখানে ভারত এবং পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১৩৫তম এবং ১৪৫তম স্থানে। অপরদিকে, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০২১-২২ অনুযায়ী, মানব উন্নয়ন সূচকে ১৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম; ২০২০ সালে প্রকাশিত এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদনে ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৩তম। অপরদিকে, 2022 Social Progress Index অনুসারে ১৬৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এ সূচকে নানাবিধ সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে একটি দেশের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। এ প্রতিবেদন অনুসারে মৌলিক মানবিক চাহিদার বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১২; সুস্থতার বিবেচনায় ১২১; এবং সুযোগের বিবেচনায় ১৪৬। বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতি সূচকের মান ২০২২ সালে ৫৬.০৬ -এ দাঁড়িয়েছে যা ২০১১ সালে ছিল ৪৯.৭৮। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশ ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে জনসংখ্যার শতভাগকে বিদ্যুৎ কভারেজের আওতায় এনেছে।

১.৩০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) -এর অধীনে নির্ধারিত ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন। Sustainable Development Report 2022 -এ স্বীকার করা হয়েছে যে এসডিজি মূলতঃ একটি ভৌত অবকাঠামো ও মানবসম্পদে বিনিয়োগ সংক্রান্ত এজেন্ডা। তাই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে, জি-২০ দেশসমূহের উচিত স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আরো বৃহদাকারে অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা যাতে তারা (উন্নয়নশীল দেশসমূহ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারে। সরকারের এসডিজি অর্থায়ন কৌশল অনুসারে, ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২৯-৩০ অর্থবছর সময়কালে, এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের আনুমানিক ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

(২০১৫-১৬ স্থির মূল্যে) অতিরিক্ত অর্থায়নের প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে সরকারি, বেসরকারি এবং বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের ঘাটতি পূরণে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

১.৩১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ -এর মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ স্বল্প এবং মধ্যমেয়াদে গৃহীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সামনের দিনগুলোতেও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এখন বাস্তবায়নের মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে। অপরদিকে, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, দৃঢ়, অভিযোজিত, ও সমন্বিত কৌশল এবং ন্যায়সঙ্গত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য ব-দ্বীপ চ্যালেঞ্জের প্রতি ঘাতসহতা তৈরির পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

উন্নয়নের মূলধারায় জলবায়ু পরিবর্তন

১.৩২ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ শীর্ষে রয়েছে। World Climate Risk Index 2021 অনুসারে এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। তাই, জলবায়ু-সহনশীল টেকসই উন্নয়ন সক্ষমতা তৈরির উদ্দেশ্যে কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় নীতি-কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযোজন ক্ষমতা এবং ঘাতসহতা তৈরিতে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। সরকার ২০২২ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan -NAP) গ্রহণ করেছে যা পরবর্তী ২৭ বছর মেয়াদে (২০২৩ হতে ২০৫০) বাস্তবায়িত হবে। অপরদিকে, ২০২১ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ হালনাগাদকৃত এনডিসি (Updated NDC) উপস্থাপন করেছে। এখন সরকার NAP এবং Updated NDC -এর সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান, ২০০৯ হালনাগাদ করছে। পাশাপাশি, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় মেয়াদে মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (Mujib Climate Prosperity Plan – MCPP) গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে জলবায়ু ঝুঁকি হতে ঘাতসহতা এবং সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেয়া। এ পরিকল্পনা অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বাংলাদেশ মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৩০ শতাংশ উৎপাদন করবে।

১.৩৩ হালনাগাদকৃত এনডিসি -এর অধীনে, গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে তার মধ্যে রয়েছে: নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, পরিবহন উপখাতে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্প উপখাতে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কৃষিতে সৌর শক্তির বর্ধিত ব্যবহার, ইত্যাদি। ইটের ভাটায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক ভবনে শক্তি সাশ্রয়ী

যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানো হবে। এছাড়া ধানক্ষেত, সারের ব্যবহার, আন্ত্রিক গাঁজন, ও বর্জ্য হতে নির্গমন হ্রাসে নজর দেওয়া হবে। পাশাপাশি, বন উজাড় নিয়ন্ত্রণ, বনায়ন/পুনঃবনায়ন, পৌর কঠিন বর্জ্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য 3R নীতি নিশ্চিতকরণসহ পরিবেশবান্ধব কৌশলের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

১.৩৪ অভিযোজনের ক্ষেত্রে, National Adaptation Plan (NAP) -এ কার্যকর অভিযোজন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এমন একটি জলবায়ু সহনশীল দেশ গড়ার প্রত্যয় বিবৃত হয়েছে যা একটি দৃঢ় সমাজব্যবস্থা এবং বাস্তুতন্ত্রকে ধারন করবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উদ্দীপনা যোগাবে। এ পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে আটটি স্বতন্ত্র সেক্টর অন্তর্ভুক্ত: পানিসম্পদ; দুর্যোগ; সামাজিক নিরাপত্তা; কৃষি; মৎস্য, জলজ সম্পদ, ও প্রাণিসম্পদ; নগর এলাকা; বাস্তুতন্ত্র, জলাভূমি এবং জীববৈচিত্র্য; নীতি এবং প্রতিষ্ঠান; এবং সক্ষমতা উন্নয়ন, গবেষণা, ও উদ্ভাবন। NAP বাস্তবায়নে মোট ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের প্রয়োজন, যার ৭২.৫ শতাংশ ২০৪০ সালের মধ্যে বিনিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

বক্স ২: National Adaptation Plan of Bangladesh (2023-2050)

লক্ষ্য ১: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর দ্বারা প্ররোচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করা;

লক্ষ্য ২: খাদ্য, পুষ্টি, এবং জীবিকার নিরাপত্তার জন্য জলবায়ু-সহনশীল কৃষির বিকাশ;

লক্ষ্য ৩: উন্নত নাগরিক পরিবেশ এবং সুস্থতার জন্য জলবায়ু-স্মার্ট শহর গড়ে তোলা;

লক্ষ্য ৪: বন সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির কল্যাণে প্রকৃতি নির্ভর সমাধান গ্রহণ;

লক্ষ্য ৫: পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অভিযোজনের বিষয়সমূহকে অঙ্গীভূত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা; এবং

লক্ষ্য ৬: অভিযোজনের লক্ষ্যে রূপান্তরমূলক সক্ষমতার উন্নয়ন ও উদ্ভাবন নিশ্চিতকরণ।

১.৩৫ NAP -এর ছয়টি লক্ষ্য মোট ২৩টি বিস্তৃত কৌশল এবং ২৮টি ফলাফলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে যাতে জলবায়ু-প্ররোচিত দুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত আছে। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক অভিযোজন, সুশাসন, বর্ধিত জলবায়ু অর্থায়ন ও রূপান্তরমূলক সক্ষমতা, এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, অবকাঠামো ও অন্যান্য আর্থসামাজিক খাতের বিকাশ ঘটাবে। এতে ১১টি জলবায়ু প্রভাবিত ক্ষেত্র বিবেচনায় নেয়া হয়েছে এবং উন্নত অভিযোজন চর্চা ও খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ১১৩টি কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে গৃহীত ৫২টি জলবায়ু অভিযোজন প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্পূর্ণ NAP প্রক্রিয়া জুড়ে নারী ও বিভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যুবা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

২.১ গত এক দশক ধরে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যদিও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৫ শতাংশে নেমে এসেছিল, তবে সরকারের টেকসই ও পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। ফলস্বরূপ, ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়ে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এটি আরও বেড়ে ৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ইউক্রেন পরিস্থিতিকে ঘিরে চলমান ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সুদের হার বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ওপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বিভিন্ন দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে একদিকে যেমন জীবনযাত্রার মান কমেছে তেমনি পাশাপাশি বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাকেও তা দুর্বল করে দিয়েছে। তাই এ মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা। মুল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ইতোমধ্যে সুদের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য কমে আসতে শুরু করেছে এবং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গৃহীত নীতিকৌশলসমূহ মধ্যমেয়াদে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

২.২ বাংলাদেশ ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উত্তরণের সকল শর্ত পূরণ করেছে এবং ইতোমধ্যে দেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব লক্ষ্য সামনে রেখে, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অগ্রাধিকার খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোবাবিলাসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য-বৈষম্য দূর করা, ব্যবসায় পরিবেশের উন্নতি সাধন এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য নীতি সহায়তা প্রদান ইত্যাদির ওপর বিশেষ জোর দেয়া গেলে লক্ষ্য পূরণে তা সহায়ক হবে। সামগ্রিকভাবে দেশে মধ্যমেয়াদে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এর ফলে আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে আসবে এ আস্থার ভিত মজবুত হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

প্রকৃত খাত

২.৩ জনসংখ্যায় তরুনদের আধিক্য, তৈরি পোশাকের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাস আয় গতি স্থিতিশীল থাকা এবং মজবুত সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা গত দেড় দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছর ছাড়া গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেশ গতিশীল ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়ে ৬.৯৪ শতাংশে এবং তারপরে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দ্রুত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের মূল কারণ ছিল শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, বিশেষ করে ব্যক্তিখাতে ভোগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগ। অন্যদিকে, সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির প্রধান কারণ হচ্ছে ম্যানুফাকচারিং এবং সেবা খাত।

সারণি ২: চাহিদার দিক থেকে জিডিপি প্রবৃদ্ধির খাতভিত্তিক অবদান

উপাদান	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
ব্যক্তিখাতে ভোগ ব্যয়	৪.১৯	৬.২৮	৩.৩০	১.৯৮	৫.২৭	৪.৯৭
সরকারিখাতে ভোগ ব্যয়	০.৪২	০.৩১	০.৭৮	০.১২	০.৪১	০.৩৭
বেসরকারি বিনিয়োগ	১.৩৬	৩.৪২	২.১৬	০.০৬	১.৯১	২.৯২
সরকারি বিনিয়োগ	১.১৭	০.৩১	০.০৫	১.১৯	০.৬৮	০.৮৫
নীট রপ্তানি	-১.১৬	-৩.৩৩	১.৩৫	-০.১৮	-১.৪৬	-২.১৯
পরিসংখ্যানগত ভ্রান্তি	০.৬০	০.৩৩	০.২৪	০.২৮	০.১২	০.১৮
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	৬.৫৯	৭.৩২	৭.৮৮	৩.৪৫	৬.৯৪	৭.১০

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৪ চলমান মূল্যস্ফীতির উর্দ্ধমুখী চাপ ক্রমাগত সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসা এবং একইসাথে বহি:বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন গতিশীল হওয়ায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে ত্বরান্বিত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২২ সালের জুন মাসে বাজেট ঘোষণার সময় মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অন্যান্য বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বিশ্বের দেশসমূহকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করায় প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা কমে গিয়েছে। ফলস্বরূপ, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬.০৩ শতাংশ পরিমিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রাক্কলন করেছে যে মধ্যমেয়াদে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসের কারণে প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে গতি ফিরে পাবে।

২.৫ গত পাঁচ বছরে (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর) শিল্প, সেবা, এবং কৃষি খাতে বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৯.১, ৫.৯ এবং ৩.৩ শতাংশ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং পশ্চিমা দেশসমূহে উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১১.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ১১.৬ শতাংশ।

সারণি ৩: জিডিপি'র খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
কৃষি	৩.৫৪	৩.২৬	৩.৪২	৩.১৭	৩.০৫
শিল্প	১০.২০	১১.৬৩	৩.৬১	১০.২৯	৯.৮৬
সেবা	৬.৫৫	৬.৮৮	৩.৯৩	৫.৭৩	৬.২৬

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২.৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সাময়িক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৩ প্রাক্কলন করেছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (MTMF) তে এ প্রবৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ৭.৫ শতাংশ, ৭.৮ শতাংশ এবং ৮.০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ১০: জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ)

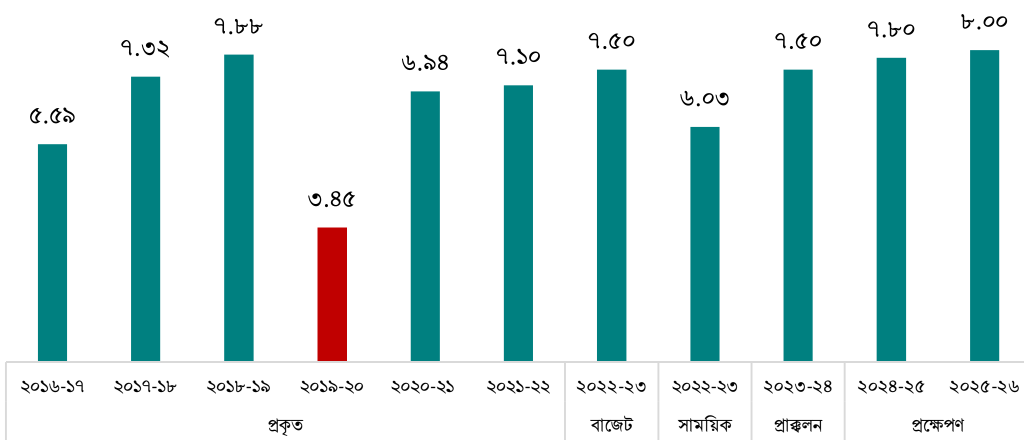

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থ বিভাগ

২.৭ ২০২১-২২ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতে যথাক্রমে ৩.১ শতাংশ, ৯.৯ শতাংশ ও ৬.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। ঐ সময়ে বিরাজমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বিবেচনায় এ প্রবৃদ্ধি বেশ সন্তোষজনক। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসেব অনুযায়ী আগামী বছরগুলিতে বিশ্ব জিডিপি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশের মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রাকে সমর্থন করে। ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নে সরকার যে বিশেষ জোর দিয়েছে তা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের মতো বড় প্রকল্প সরকার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে যা নিজস্ব অর্থায়নে মেগাপ্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের আত্মবিশ্বাস বহুগুনে বাড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬ (মেট্রো রেল), চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল এবং পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরসহ আরও বেশ কয়েকটি মেগাপ্রকল্প চলমান রয়েছে যা চালু হলে দেশের ভৌত অবকাঠামো খাতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

সারণি ৪: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং অর্জিত/ প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (শতকরা)

অর্থবছর	অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	প্রকৃত*/প্রাক্কলন
২০২০-২১	৭.৪	৬.৯৪*
২০২১-২২	৭.৭	৭.১*
২০২২-২৩	৮	৬.০৩[সা]
২০২৩-২৪	৮.৩	৭.৫
২০২৪-২৫	৮.৫	৭.৮
২০২৫-২৬	-	৮.০

সূত্র: জিইডি, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সা= সাময়িক

২.৮ ২০২০-২০২২ সময়ে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের পরে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বৈশ্বিক পুনরুদ্ধারের জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়নি। বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটে ক্রমাগত অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রবৃদ্ধির অনুমান সংশোধন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী পূর্বের প্রত্যাশার তুলনায় আরও কম প্রবৃদ্ধির আশংকা করছে। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তবে দেখা গেছে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময়েও বাংলাদেশ অত্যন্ত সফলতার সাথে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং পরবর্তীতে আবার উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে এসেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষ নাগাদ অর্থনীতিতে কোভিড-পূর্ববর্তী গতি ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। চলমান বাস্তবতা এবং মধ্যমেয়াদের সম্ভাবনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। যদিও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রাক্কলন করা হয়েছিল, তবে গত তিন বছরের সমস্যা-সংকুল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছর নাগাদ ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত।

২.৯ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সঞ্চালনের লক্ষ্যে সরকার সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩২.০ শতাংশ যেখানে বেসরকারি এবং সরকারি খাতের অবদান যথাক্রমে ২৪.৫ এবং ৭.৫ শতাংশ । তবে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগের মাত্রা আরও বাড়াতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, তাই উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়ানো গেলে বিনিয়োগের প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সরকার প্রকল্পের নকশা এবং বাস্তবায়ন উভয় স্তরেই কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

২.১০ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি বাড়তে থাকে। ২০২৩ সালের মার্চে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯.৩ শতাংশে উপনীত হয়। তবে ইতোমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতিসুদ হার বাড়িয়ে দেয়ায় এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকায় বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে। ফলে আগামী মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে অর্থ বিভাগ ২০২২-২৩ অর্থবছরে গড় মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা আরও কমে ৬.০ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে প্রাক্কলন করেছে। মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সুরক্ষা দিতে সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে এবং একই সাথে মুদ্রা খাতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করছে।

চিত্র ১১: ১২ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি (শতাংশ)

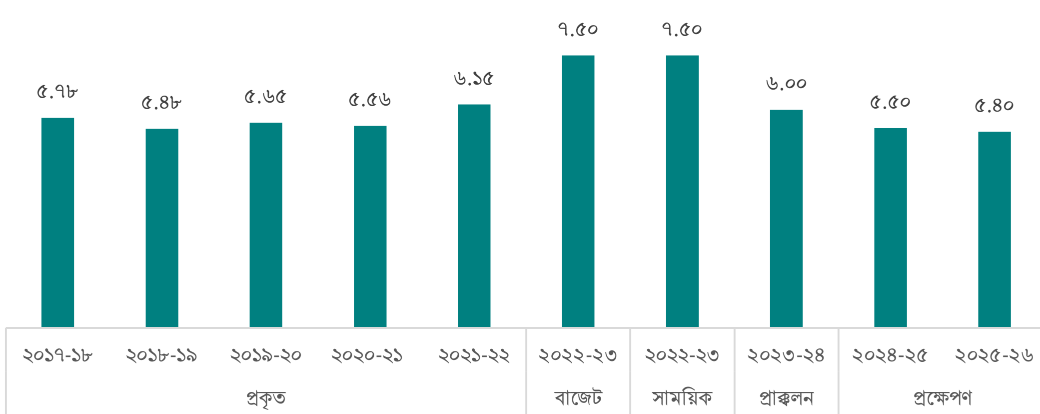

সূত্রঃ বিবিএস, অর্থ বিভাগ

২.১১ খাদ্য মূল্যস্ফীতি দরিদ্রদের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এ বিবেচনায় সরকার ভর্তুকি ও প্রণোদনাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করছে। কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়াতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ কৃষি এবং অ-কৃষি গ্রামীণ ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ২১০.৬৬ বিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরে চেয়ে প্রায় ১৩.৬৬ শতাংশ বেশি। এছাড়া সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক নীতির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে শিল্প উৎপাদনের সাধারণ সূচক (মাঝারি এবং বড় আকারের উৎপাদন) ৮.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা শিল্প উৎপাদনের সম্প্রসারণকেও নির্দেশ করে।

রাজস্ব খাত

২.১২ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে সহনীয় মাত্রার বাজেট ঘাটতি বজায় রেখে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করছে। তবে বাংলাদেশে কর-জিডিপি অনুপাত যেহেতু তুলনামূলকভাবে কম, সেহেতু সরকার রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে করের পরিমাণ ও করদাতার সংখ্যা দু'টোই বাড়বে এবং তা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ হবে জিডিপির ১১.২ শতাংশ।

২.১৩ সরকারি ব্যয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা প্রদান ও সম্পদের দক্ষ পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের সময়ে সরকার জনগণের জীবন রক্ষার পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান যাতে হ্রাস না পায় সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। ঐ সময় কর্মসংস্থান বজায় রাখা, আয় সহায়তা প্রদান, পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা, গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর সরকার বিশেষ জোর দিয়েছে। এজন্য ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজের একটি ব্যাপক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি সরকার হাতে নেয়, যার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি অতিমারির অভিঘাত হতে পুনরুদ্ধার লাভ করে দ্রুত উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে ফিরে এসেছে। অথচ অনেক দেশ এখনও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আমাদের অর্থনীতির জন্য যে ঝুঁকি তৈরি করেছে তা হ্রাস করার জন্য ব্যয় যৌক্তিককরণ ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়ন করছে। মধ্যমেয়াদে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের কাছাকাছি রেখে জনকল্যাণ ও উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২.১৪ ঐতিহাসিকভাবে রাজস্ব সংগ্রহ এবং বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে সরকারি ব্যয়ের আকার জিডিপির তুলনায় কম। এই অবস্থার উন্নয়নে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির

লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির প্রায় ১৬.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা (পিএফএম) প্রক্রিয়ায় ব্যাপক সংস্কার করছে। সামগ্রিক জনসেবার মানোন্নয়ন, বাজেট বরাদ্দের আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, বাজেট বাস্তবায়নের প্রকৃত সময় তদারকি এবং ব্যয় সংহতকরণের জন্য পিএফএম কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২৩) বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং সম্প্রতি নতুন পিএফএম সংস্কার কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২০২৮) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আগামীতে বাস্তবায়িত হবে। পিএফএম সংস্কারের আওতায় iBAS++ পদ্ধতির সাহায্যে পেনশন অটোমেশন এবং ই-চালান অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাজেট ব্যবস্থাপনার সহজীকরণে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। একই সঙ্গে iBAS++ পদ্ধতির সাহায্যে সরকারের সকল ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে 'গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি)' পেমেন্ট সিস্টেমের আওতায় আনা হচ্ছে, যা সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনবে। এছাড়াও মধ্যমেয়াদে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সরকারি বরাদ্দ iBAS++ পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেজারি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের (টিএসএ) আওতায় আনা হচ্ছে।

আর্থিক খাত

২.১৫ সরকারের মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্য হল মূল্য স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সর্বোত্তম উপায়ে আর্থিক চলকসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির (সিপিআই) লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্থ কত দ্রুত হাত বদল হয় এ সকল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের মাত্রা নর্ধারণ করে থাকে। এ লক্ষ্যে আর্থিক কর্মসূচিকে সাপ্তাহিক (এবং এমনকি দৈনিক) ভিত্তিতে বিভক্ত করে পরিচালনা করা হয়, যাতে খোলা বাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থায় তারল্যের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সহজ হয়। তবে এ কৌশলের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে উৎপাদন এবং মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ওপর। যদিও অত্যাধুনিক অর্থনৈতিক মডেলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অর্থের ভূমিকা রয়েছে বলে অনুমান করা হয়, তবুও উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে কখনও কখনও অর্থ সরবরাহ এবং মূল্যস্ফীতির মধ্যে পরিষ্কার সম্পর্ক পাওয়া কঠিন হয়।

২.১৬ দৈনিক ভিত্তিতে কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা মূলত রেপো, রিভার্স রেপো এবং সাপ্তাহিক নিলাম কার্যক্রমের (weekly auctions) মাধ্যমে পরিচালিত হয়, যা আন্তঃব্যাংক কল মানি রেটকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতির অন্যান্য কৌশলসমূহের সাথে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) এবং স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রেশিও (এসএলআর) নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে, যা মুদ্রা প্রবাহের হারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ বজায় রাখতে সহায়তা করে। আর্থিক লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক নীতিকাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থের স্থিতিশীল চাহিদা বজায় থাকা, পর্যাপ্ত আর্থিক তথ্য-উপাত্তের সরবরাহ নিশ্চিত করা, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, কার্যকর আর্থিক নীতি সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপস্থিতি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ বেশ কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। মধ্যমেয়াদে সরকারের মুদ্রানীতিতে এ সকল বিষয় বরাবরের মত অগ্রাধিকার পাবে।

২.১৭ বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা নীতিতে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার নীতি কৌশলের সামঞ্জস্য বিধান করে থাকে। তবে ২০২৩ সালের জুলাই থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মুদ্রানীতি কাঠামোর আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে সরে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। অর্থের চাহিদার স্থিতিশীলতা কমে যাওয়ায় এবং অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন অর্থনৈতিক কার্যকলাপে তেমন প্রত্যাশি প্রভাব না ফেলায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ভিত্তিক কাঠামো বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, মূল্যস্ফীতিকে লক্ষ্য করে প্রণীত নীতি সহজবোধ্য এবং এর পরীবীক্ষণ সহজ। পরিবর্তিত এ কাঠামো আরও স্বচ্ছ এবং নির্ভরযোগ্য, যা বাজার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এবং জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে সহায়তা করে। সুস্পষ্ট মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নীতিগত অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারে এবং এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা ও এর প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

২.১৮ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সিপিআই মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশের মধ্যে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১১.৫ শতাংশ ও ১৮.৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। ১১ মে ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে ৯.০৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ২০২৩ সালের মার্চ মাসের শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৬.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি এবং পরিষেবা খাতের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য প্রবৃদ্ধি-বান্ধব মুদ্রানীতি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২.১৯ চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত (ভারিত গড়) এবং ঋণ (ভারিত গড়) উভয় সুদের হার ধীরে ধীরে বাড়ছে। সকল ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ঋণ এবং আমানতের ওপর ভারিত গড় সুদের হারের পার্থক্য ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্বের মাসের তুলনায় যথাক্রমে ২.৯৬ শতাংশ এবং ১.১৫ শতাংশ বেড়েছে। পূর্বের মাসের তুলনায় ২০২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারিতে আমানতের ওপর ভারিত গড় সুদের হার ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৪.৩১ শতাংশ এবং ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে ৭.৭২ শতাংশ বেড়েছে।

বহিঃখাত

২.২০ UNCTAD (মার্চ ২০২৩) অনুসারে, ২০২২ সালে বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, কিন্তু ২০২২ সালের শেষে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমতে থাকে। ২০২২ সালের চতুর্থ প্রান্তিকের হিসাব অনুযায়ী পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাসহ উন্নয়নশীল দেশের বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বিশেষভাবে কম ছিল। UNCTAD প্রতিবেদন অনুসারে ২০২৩ সালের প্রথম প্রান্তিকে বাণিজ্য স্থবিরতা শুরু হবার আশংকা রয়েছে, তবে বছরের দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

২.২১ কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ২০২২ সালের গোড়ার দিকে কমতে শুরু করার পর, বাংলাদেশের আমদানিতে উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, যার ফলে দেশে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (BoP) এবং মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশি টাকার ক্রমান্বয়ে অবচিতি, বিলাসবহুল এবং অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহিত করা, আমদানির মূল্য পর্যবেক্ষণ, আমদানির বিকল্প খাতকে সহায়তা করা, প্রবাস আয়ের প্রবাহ সহজতর করার জন্য মোবাইল আর্থিক পরিষেবাগুলিকে অনুমতি প্রদান, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২.২২ উপাত্ত থেকে দেখা যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চের মধ্যে রপ্তানি ৮.০৭ শতাংশ বেড়েছে, যা ২০২১.২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চে ৩৩.৪১ শতাংশ ছিল। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরে বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ মাসে তৈরি পোশাক (১২.৬৩ শতাংশ), নিটওয়্যার (১১.৭৮ শতাংশ), চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য (২.৫৬ শতাংশ), প্লাস্টিক পণ্য (৩৪.০৭ শতাংশ), এবং বিবিধ পণ্যের (১২.১২ শতাংশ) রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই সময়ে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি ২১.২৩ শতাংশ, প্রকৌশল পণ্য ৩৩.৬৫ শতাংশ, কৃষি পণ্য ২৮.৩১ শতাংশ কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি ৩৫.৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণাত্মক হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমদানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.৩১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে যে সরকারের পদক্ষেপ রপ্তানিকে ক্ষতিগ্রস্থ করা ছাড়াই আমদানি প্রবৃদ্ধিকে সংকুচিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

২.২৩ প্রবাস আয় অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি প্রবাস আয় মাইক্রো-লেভেলে জীবনযাত্রার মান এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি করে থাকে। প্রবাস আয় বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ চলমান রেখেছে যেমন, প্রবাস আয়ে প্রেরণের জন্য ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদান, প্রবাস আয় সংক্রান্ত নিয়ম ও প্রবিধানের সরলীকরণ, প্রবাস আয় প্রেরণের প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস , জনশক্তি রপ্তানির জন্য নতুন বাজার অনুসন্ধান, ইত্যাদি। এ সকল পদক্ষেপের ফলে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাস আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৩৪ শতাংশ বেশি।

চিত্র ১২: প্রবাস আয়ের গতিধারা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

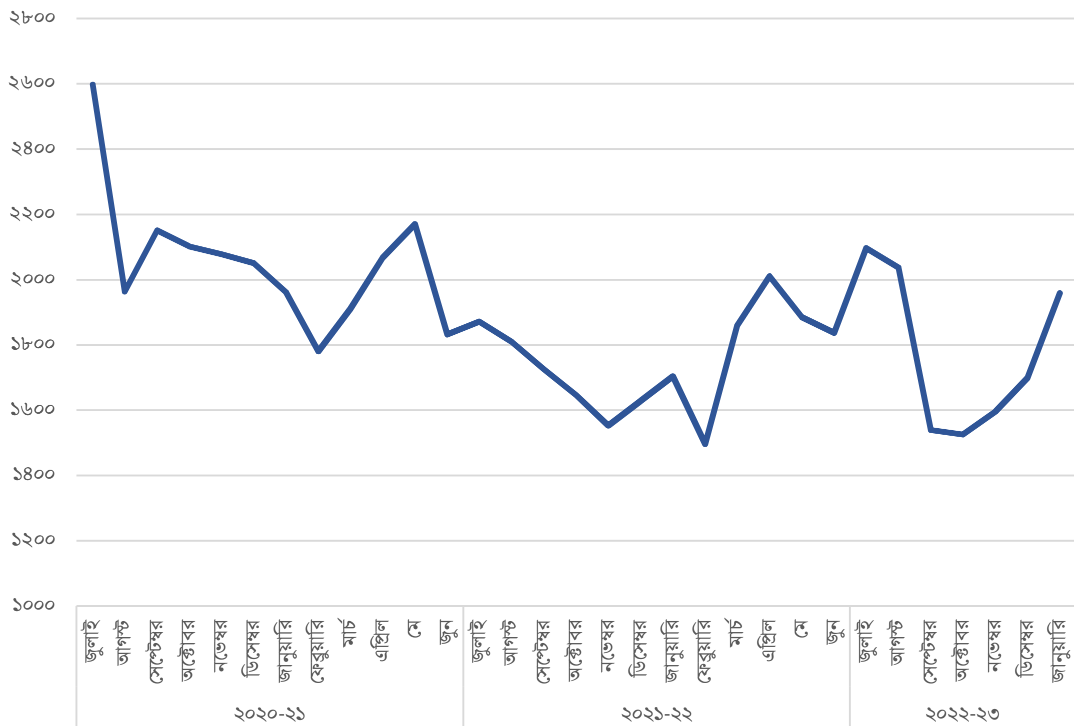

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২.২৪ ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানির নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির কারণে, চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের চলতি হিসাবের ভারসাম্য ছিল -৩.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে -১৪.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। অন্যদিকে একই সময়ে, আর্থিক হিসাব দাঁড়িয়েছে -১.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ১১.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। ২০২৩ সালের মার্চ শেষে সামগ্রিক ভারসাম্য ছিল -৭.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা আগের বছরের একই সময়ে -৩.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। যদিও ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উন্নতি হয়েছে, তবে আর্থিক হিসাবের ঘাটতির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্চ ২০২৩ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩১.১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২২ সালের একই সময়ে ৪৪.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল।

চিত্র ১৩: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

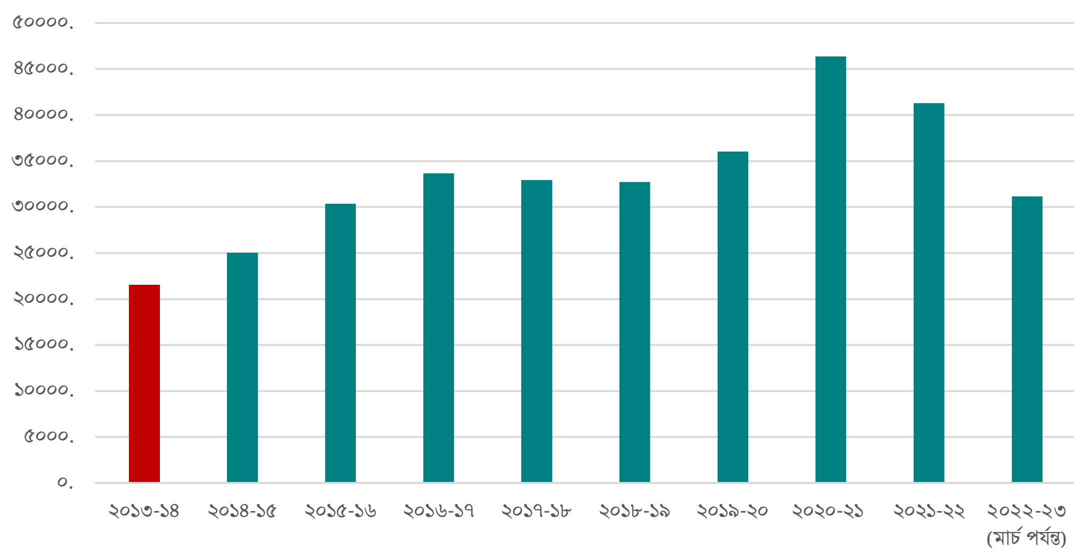

২.২৫ বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে (BOP) স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এলসি মার্জিনের পরিমাণ বাড়িয়েছে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহ কমাতে উচ্চতর অগ্রিম অর্থপ্রদানের প্রয়োজন হয়েছে। উপরন্তু, বাণিজ্যভিত্তিক অর্থ পাচার রোধের জন্য ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ঋণপত্রের (L.C.s) ক্ষেত্রে প্রাক-অনুমোদন চালু করা হয়েছে। অধিকন্তু সরকার যানবাহন, জাহাজ এবং বিমানের সরকারি ক্রয় বিলম্বিত বা স্থগিত করেছে এবং আমদানিকৃত সামগ্রীর ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এমন সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে এর ফলে সরবরাহ খাতে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রবাস আয়ের তহবিল স্থানান্তর এবং প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রার আমানতের সুদের হারের সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে। উপরন্তু ৫০০০ মার্কিন ডলারের বেশি প্রবাস আয়ের উৎস প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা বাতিল করা হয়েছে।

২.২৬ অর্থ বিভাগের হিসাব অনুযায়ী মধ্যমেয়াদে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শেষ নাগাদ চলতি হিসাব ভারসাম্য ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসবে। এ সময়ে রপ্তানি ৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং আমদানি ১০১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকবে আনুমানিক ৪৮বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উদীয়মান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

২.২৭ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শীঘ্র থামার সম্ভাবনা খুব কম। সংঘাতের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রধান পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। যদিও পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো কর্তৃক সুদের হার বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমতে শুরু করলে উর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতিও কমতে থাকে। এ প্রবণতা কিছুটা স্বস্তির উৎস হয়েছে, কিন্তু মধ্যমেয়াদে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে কিনা তা অনিশ্চিত। আগামী কয়েক মাসে ইউক্রেনের লড়াই তীব্রতর হলে এবং এতে অন্য দেশগুলি জড়িয়ে পড়লে বিশ্ব অর্থনীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.২৮ বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চাপ মোবাবিলা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। পরিস্থিতি উন্নতির জন্য এ সকল ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি। আমদানির বর্তমান নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল থাকলে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি করার লক্ষ্যে প্রবাস আয় বৃদ্ধি, প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণের অর্থ ছাড় এবং বাজেট সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়া হবে।

২.২৯ সম্প্রতি বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি কমতে শুরু করেছে। আইএমএফ এর মতে, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ উন্নত অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ২.৬ শতাংশে নেমে আসবে। তবে, আইএমএফ আরও অনুমান করেছে যে উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি শক্তিশালী থাকবে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মূল্যস্ফীতি প্রায় ৭ শতাংশে থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সরকারের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.২৪ শতাংশ, যা এখনও অনেক বেশি।

২.৩০ মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকার ভর্তুকি এবং প্রণোদনা বাবদ মোট ৮১৪.৯ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও সারের মূল্যবৃদ্ধির কারণে, ভর্তুকি/ প্রণোদনার ব্যয় বাড়াতে হয়েছে। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ভর্তুকি/প্রণোদনা বাবদ সংশোধিত বাজেটে মোট ৯৯১.৫ বিলিয়ন টাকা (জিডিপির ২.২২ শতাংশ) ধরা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ভর্তুকি ও প্রণোদনার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ আরও কিছুটা বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে সরকার ভর্তুকি কমাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে দেশী বাজারের জ্বালানি মূল্যের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভর্তুকি এবং প্রণোদনার পরিমাণ যৌক্তিককরণের জন্য সরকার বিবেচনা করছে। তাই মধ্যমেয়াদে ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাবদ বরাদ্দ কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২.৩১ বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ধারিত সুবিধা ভোগ করছে। তবে ২০২৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এলডিসি তালিকা থেকে

উত্তরণ ঘটার পর এ সুবিধাগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করা, উচ্চ-মানের ও উচ্চ মূল্য সংযোজন উৎপাদনের জন্য পরিবেশ তৈরি করা এবং বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি করা জরুরি।

২.৩২ বাংলাদেশ বর্তমানে ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে যার লক্ষ্য হচ্ছে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা, মাথাপিছু আয় ১২,৫০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা, বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা। এ উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর-জিডিপি অনুপাত বাড়িয়ে জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশে উন্নীত করা। টাকা এবং ডলারের মধ্যকার বিনিময় হারের সাম্প্রতিক সুস্পষ্ট অবচিতি টাকার অতীতের প্রকৃত মূল্যমানকে সংশোধন করেছে; তবে ২০৪১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে টাকার মূল্যমান ধরে রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হবে। ২০৪১ সালের লক্ষ্য পূরণে এ সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পরিকল্পিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

পরবর্তী অর্থবছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (২০২৩-২৪ অর্থবছর)

২.৩৩ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়লে তা হবে মানব জাতির জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়কর। তবে যৌক্তিক প্রত্যাশা অনুযায়ী এ সংঘাত ততদূর গড়াবে না বলেই অনুমিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে যদিও ইউক্রেনে সহিংসতা আগামী বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে পারে, তবে তা চরম সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় রূপ নেবে না, এমনকি আলোচনার মাধ্যমে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২.৩৪ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। তবে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে শস্য রপ্তানির চুক্তি হওয়ায় এবং খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় খাদ্যপণ্যের দাম কমতে শুরু করে। রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যুদ্ধের মাত্রা চরম আকারে না পৌঁছালে তেল, গ্যাস, সার ও শস্যের দাম আর বাড়বে না।

২.৩৫ মূল্যস্ফীতি মোকাবিলার লক্ষ্যে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি সুদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সুদের হার এবং সিকিউরড ওভারনাইট ফাইন্যান্সিং রেট উভয়ই ১০ মে ২০২৩ এর মধ্যে ৫ শতাংশের ওপরে পৌঁছেছে। এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে সুদের হার ইতোমধ্যেই শীর্ষে পৌঁছেছে এবং মধ্যমেয়াদে এই হার ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

২.৩৬ গত এক দশকে শস্য এবং অন্যান্য কৃষি সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ এখন সক্রিয়ভাবে অব্যবহৃত আবাদি জমি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন আরও

বাড়াচ্ছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আশংকাজনকভাবে কমবে বা মধ্যমেয়াদে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বাড়বে এমন কোনো দৃশ্যমান ইঙ্গিত নেই। অতএব, ধরে নেওয়া হয়েছে যে মধ্যমেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমস্যা হবে না।

২.৩৭ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও সারের দাম ক্রমান্বয়ে কমছে। এটি দেশীয় বাজারে মূল্যস্ফীতি কমাতে সাহায্য করবে। তবে সম্প্রতি - বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের ওপর চাপের কারণে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। এটি ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির একটি বড় কারণ। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক নীতিগুলির ফলে ইতোমধ্যে অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছে। তাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে মধ্য মেয়াদে মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল হবে।

২.৩৮ বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত বেশ কম এবং তাই এ ক্ষেত্রে উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর আদায় প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ এবং করের ভিত্তি বাড়াতে জনবল বৃদ্ধিসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তাই এ পদক্ষেপগুলো কর-রাজস্বের অনুপাত বাড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২.৩৯ মাথাপিছু আয় বাড়ার সাথে সাথে নিম্ন-আয় থেকে মধ্যম আয়ের শ্রেণিতে অধিক সংখ্যক লোক অন্তর্ভুক্ত হবে। এটি অভ্যন্তরীণ ভোগ বাড়িয়ে তুলবে এবং তা জিডিপি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সাথে মোট বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাবে।

২.৪০ বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। তবে দেশের রপ্তানি মূলতঃ তৈরি পোষাক নির্ভর। রপ্তানি বহুমাত্রিক করার পাশাপাশি বাংলাদেশী পণ্যের নতুন বাজার খুঁজে বের করার লক্ষ্য হাতে নেয়া হয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে মধ্যমেয়াদে রপ্তানি স্বাস্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে।

২.৪১ ঋণ পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ অবস্থা বেশ সন্তোষজনক। প্রতি বছর টেকসই ঘাটতি নিশ্চিত করে বাজেট তৈরি করা হয় এবং এর ফলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে মধ্যমেয়াদে কোনো ঋণ সংকটের উদ্ভব ঘটবে না।

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট এবং প্রকৃত অর্জনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

২.৪২ পরিকল্পিত আয়-ব্যয় থেকে প্রকৃত ফলাফলের বিচ্যুতির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতের নীতি প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে। সে প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো এ বিষয়টি মধ্যমেয়াদি নীতি বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তথ্য পরিপূর্ণভাবে থাকার জন্য জন্য এই বছরটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। মধ্যমেয়াদি নীতি বিবৃতির পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে এ বিশ্লেষণে আরো বেশি সংখ্যক বছর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২.৪৩ ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট প্রকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩.৮৭ শতাংশ কম ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল এনবিআর কর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১১.২৫ শতাংশ কম ছিল। পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরে এনবিআর কর বৃদ্ধির হার ছিল ২০ শতাংশ।

২.৪৪ কোভিড -১৯ অভিঘাত থেকে পুনরুদ্ধারের পর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে প্রকৃত ব্যয় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের চাইতে ১৪.১৬ শতাংশ কম হয়। পরিচালন ব্যয় ছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬.৪২ শতাংশ কম। এ সময় যদিও সামগ্রিক ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম ছিল, তবে ঘাটতি অর্থায়নের জন্য দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর বেশি নির্ভর করায় অভ্যন্তরীণ সুদ বাবদ ব্যয় ১৮.০৯ শতাংশ বেড়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের হারও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৭.৪৩ শতাংশ কম অর্জিত হয়।

২.৪৫ বৈদেশিক ঋণ বিতরণ হ্রাস পাওয়ায় বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৩.৪৭ শতাংশ কম। তবে দেশীয় ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দেশীয় অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৫৫ শতাংশ বেশি হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বছর সরকার জাতীয় সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র ও টিআইএন সার্টিফিকেট জমা প্রদান বাধ্যতামূলক করাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে সুদের হার কমিয়ে দেয়। ফলে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রয় থেকে অর্থায়ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৬.৬৭ শতাংশ কম হয়েছে।

সারণি ৫: মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (২০২৩-২৪ হতে ২০২৫-২৬)

সূচকসমূহ	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩**	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত	বাজেট	সিসি	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	৭.১	৭.৫	৬.৫	৬.০৩	৭.৫	৭.৮	৮.০
মূল্যস্ফীতি (%)	৬.১৫	৫.৬	৭.৫	৭.৫	৬.০	৫.৫	৫.৪
মোট বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৩২.০	৩১.৫	৩০.০	২৭.৮	৩৩.৮	৩৫.১	৩৬.০
বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	২৪.৫	২৪.৮	২৪.১	২১.৮	২৭.৪	২৮.৮	২৯.৪
সরকারি বিনিয়োগ (জিডিপি'র %)	৭.৫	৬.৭	৫.৯	৬.০	৬.৩	৬.৩	৬.৬
রাজস্ব (জিডিপি'র %)	৮.৪	৯.৭	৯.৭	৯.৮	১০.০	১০.৪	১১.২
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (জিডিপি'র %)	৭.৪	৮.৩	৮.৩	৮.৩	৮.৬	৯.১	৯.৭
রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত (জিডিপি'র %)	০.২	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি (জিডিপি'র %)	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	১.০
সরকারি ব্যয় (জিডিপি'র %)	১৩.০	১৫.২	১৪.৮	১৪.৯	১৫.২	১৫.৪	১৬.২
তন্মধ্যে, এডিপি (জিডিপি'র %)	৪.৭	৫.৫	৫.১	৫.১	৫.৩	৫.৫	৫.৯
বাজেট ঘাটতি (জিডিপি'র শতাংশে)	-৪.৬	-৫.৫	-৫.১	-৫.১	-৫.২	-৫.০	-৫.০
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন (জিডিপি'র %)	২.৯	৩.৩	৩.১	৩.২	৩.১	৩.০	২.৯
তন্মধ্যে, ব্যাংক (জিডিপি'র %)	১.৯	২.৪	২.৬	২.৬	২.৬	২.৫	২.৪
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৭	২.২	১.৯	২.০	২.১	২.১	২.১
বেসরকারি খাতে ঋণ (প্রবৃদ্ধি %)	১৩.৭	১৫.০	১৪.১	১৪.১	১৫.০	১৬.০	১৬.০
রপ্তানি (প্রবৃদ্ধি %)	৩৩.৪	২০.০	১০.০	১০.০	১২.০	১৪.০	১৪.০
আমদানি (প্রবৃদ্ধি %)	৩৫.৯	১২.০	-৯.০	-৯.০	৮.০	১২.০	১২.০
প্রবাস আয় (প্রবৃদ্ধি %)	-১৫.১	১৬.০	৪.০	৪.০	১০.০	১৩.০	১৩.০
চলতি হিসাবে ভারসাম্য (জিডিপি'র %)	-৪.০৬	-৩.৫০	-১.৫২	-১.৪৮	-০.৯৩	-০.৬২	০.০৬
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি. মা. ড.)	৪২.৭	৪৫.৩	৩৪.৩	৩৪.৬	৩৫.৮	৪১.১	৪৮.৯
জিডিপি (চলতি মূল্যে) কোটি টাকা	৩৯৭১৭১৬	৪৪৪৯৯৫৯	৪৪৬৮৫৬৬	৪৪৩৯২৭৩	৫০০৬৭৮২	৫৬২৯৬৯১	৬৩৪১৩৯১
জিডিপি (চলতি মূল্যে) বি. মা. ড.	৪৬০.২	৪৬৮.৪	৪৪২.৪	৪৫৩.৯	৪৮১.৪	৫৩৮.৫	৬০৩.৯

*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মে ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত সাময়িক হিসাব
** এপ্রিল ২০২৩ তারিখে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল (সিসি) কর্তৃক অনুমোদিত প্রক্ষেপণ
সূত্র: অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তৃতীয় অধ্যায়
রাজস্ব আদায়ের দৃশ্যপট ও আহরণ কৌশল

৩.১ রাজস্ব আহরণ একটি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক। বাংলাদেশ তার উন্নয়ন অভিযাত্রায় ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এর মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এ রাজস্ব-জিডিপি এর হার ২০৩১ এ ১৯.৫৫% এবং ২০৪১ এ ২৪% এ উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। বিগত দশকে বাংলাদেশের উন্নয়নে যে ঈর্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে তার সাথে তাল মিলিয়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়নি। রাজস্ব আদায়ের একটি বড় অংশ আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রত্যক্ষ কর (আয় কর) এবং পরোক্ষ কর (মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক) থেকে। এনবিআর বহির্ভূত কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে মোট রাজস্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ আসে। যদিও বিগত বছরগুলোতে আমদানি শুল্কের ওপর নির্ভরতা কমেছে ও প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এ ক্ষেত্রে আরো উন্নতির সুযোগ আছে। এ অধ্যায়ে সাম্প্রতিক সময়ে রাজস্ব আদায়ের গতিধারা, রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন খাত, গত বছরে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি এবং মধ্য-মেয়াদে কর-রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে গৃহীত সংস্কারধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২ রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর জন্য কী কী উদ্যোগ নেয়া আবশ্যক তা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে রাজস্ব আহরণ কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কাঙ্খিত পরিমাণের চেয়ে অনেক কম রাজস্ব আহরণের পেছনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, অনেক বড় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, কর অব্যাহতি, কাঠামোগত দূর্বলতা, জটিল কর ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বৈষম্য এবং কর প্রদানে অনীহার সংস্কৃতি প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। বেসরকারি অংশীজনদের সহায়তা নিয়ে সরকার কর প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করা, কর আইন সহজবোধ্য করা ও কর অব্যাহতি যৌক্তিকভাবে প্রদান- বিষয়ে নিবিষ্টভাবে কাজ করছে। রাজস্ব প্রশাসনে ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা, কর আদায়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছ কর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা এবং প্রগ্রেসিভ কর ব্যবস্থা, যেখানে ধনী লোক বেশি কর দিবেন, এসবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হলে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম আরো সফল হবে।

রাজস্ব আদায়ে প্রবণতা ও খরচ: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

৩.৩ বাংলাদেশের সাথে এশিয়ার কয়েকটা দেশের কর-জিডিপি হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জিডিপির শতাংশে কর আহরণের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ কম। করের এ ধরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, যেমন- কী কী কর রাজস্বের হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে, কর কীভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে এবং আহরিত করের ধরণ ইত্যাদি । যে প্রেক্ষাপটেই বিশ্লেষণ করা হোক না কেন বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় যে অনেক কম তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাংলাদেশ সরকার তাই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে।

সারণি ৬: এশিয়ার কয়েকটি দেশে রাজস্ব আদায়ে কর-জিডিপি হারের তুলনামুলক চিত্র (কর-জিডিপির শতাংশে)

দেশ	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০২০	২০২১	২০২২
বাংলাদেশ	৪.৯২	৬.১৪	৬.৫৪	৭.০৮	৭.০০	৭.৬৪	৭.৭৭
ভারত	১৪.০৮	১৫.৬৬	১৬.১১	১৬.৭২	১৬.১৩	১৭.০৯	১৬.৯৮
লাও পিডিআর	১০.৫৭	৯.২৭	১২.৬৪	১৩.৯২	৯.৪০	১০.২৫	১০.৬২
ইন্দোনেশিয়া	৮.০৮	১২.৩৭	১১.২৩	১১.৯৬	৯.৫২	১০.৩২	১১.৫৯
ফিলিপাইন	১৩.২৬	১২.৭৭	১২.৩৯	১৩.৯০	১৫.০১	১৫.১২	১৫.৬১
ভিয়েতনাম	১২.৯৮	১৬.৫২	১৭.৬৩	১৪.৫৭	১৩.১২	১৩.৯২	১৪.০৩
থাইল্যান্ড	১৪.৭০	১৭.৯০	১৬.৩৭	১৭.৭২	১৫.৬৬	১৫.৭৪	১৫.৫৭

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৩

৩.৪ বাংলাদেশে কর-জিডিপি হার যেমন কম, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর রাজস্ব আদায়ে খরচও তুলনামূলক ভাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তবে, কর-জিডিপি হার বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং যুগোপযোগী ও আধুনিক রাজস্ব প্রশাসন গঠনের জন্য এ খাতে নতুন করে অর্থ বিনিয়োগের সুফলও বাংলাদেশ পেতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণে বাংলাদেশ

২০২০-২১ অর্থবছরে খরচ হয় মাত্র ২৫ পয়সা। এর আগের অর্থবছর ২০১৯-২০ এ এই খরচ ছিল ৩১ পয়সা। রাজস্ব আদায়ে খরচের যদি খাতওয়ারি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতি ১০০ টাকা প্রত্যক্ষ কর আদায়ে খরচ ছিল ২১ পয়সা এবং পরোক্ষ কর আদায়ে খরচ ১৩ পয়সা।

চিত্র ১৪: রাজস্ব আহরণের খরচ (২০১৯-২০ থেকে ২০২০-২১)

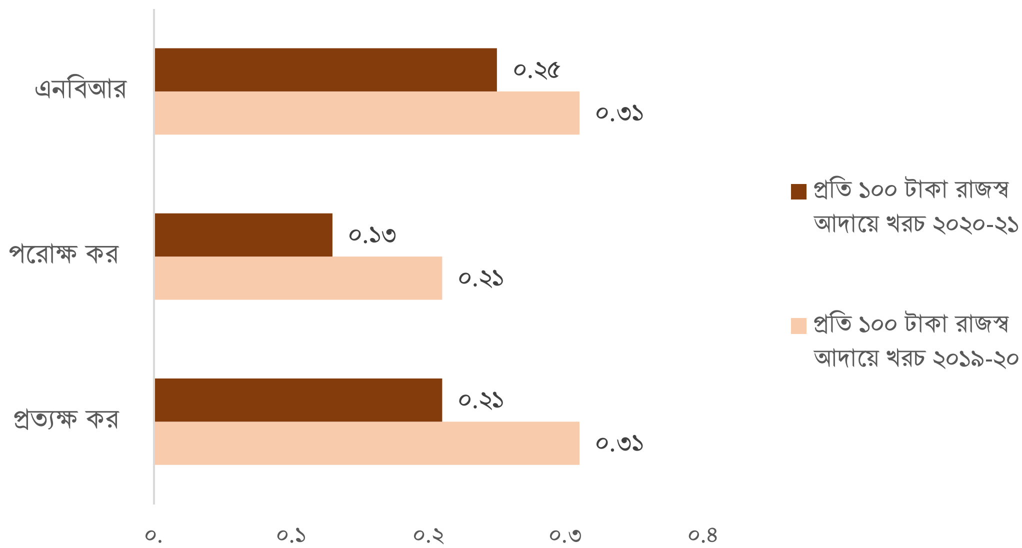

সূত্র: গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৩.৫ কয়েকটি উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের কর আদায়ের ব্যয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম ব্যয় হয়। কর-জিডিপি'র হার ও কর আদায়ের ব্যয় দুই ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্নে। এ তুলনামূলক চিত্র মূলত: কর-জাল সম্প্রসারণ এবং কর আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশের রাজস্ব প্রশাসনের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনে আরো বিনিয়োগের আবশ্যকতাকে নির্দেশ করে ।

চিত্র ১৫: বিভিন্ন দেশে প্রতি ১০০ টাকা কর আদায়ের খরচ

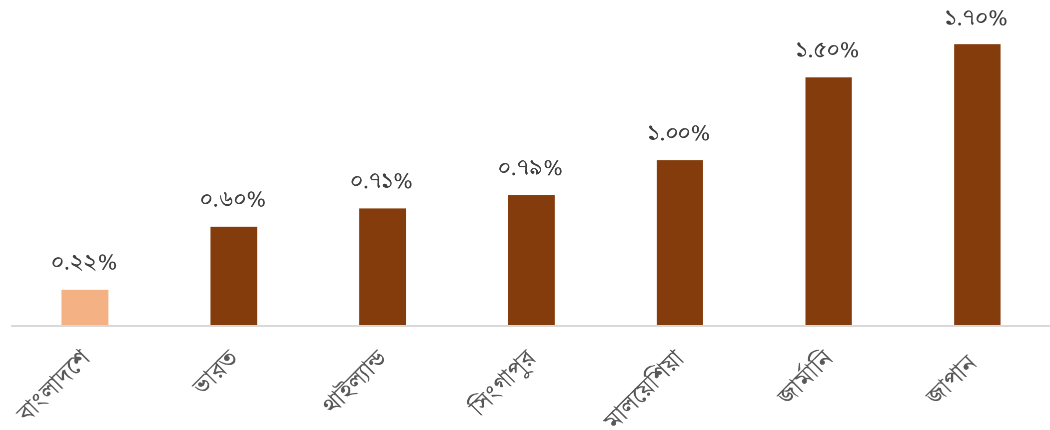

সূত্র: রাজস্ব সম্মেলন ২০২৩, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

উৎস ভিত্তিক রাজস্ব আহরণ

৩.৬ করোনাকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হ্রাস পেলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে গতি ফিরে আসে। ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ২৩.৮% প্রবৃদ্ধি হলেও তা ২০২১-২২ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ১.৮% হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ২০৩১ ও ২০৪১ এর উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হলে রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলো কী কী এবং কোন কোন খাত থেকে কী পরিমাণে রাজস্ব আদায় হয়, তার বিশ্লেষণ করলে কোন খাত থেকে ভবিষ্যতে বেশি রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৭: রাজস্ব আহরণ চিত্র (২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর, বিলিয়ন টাকা)

বছর	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	২৮৭৯.৯ (১০.৯)	৩৩৯৩ (১১.৫)	৩৭৭৮.১ (১১.৯)	৩৫১৫.৩ (১০.০)	৩৮৯০ (৯.৮)
প্রকৃত আদায়	২১৬৫.৬ (৮.২) {৭.৬}	২৫১৯ (৮.৫) {১৬.৩}	২৬৫৮ (৮.৪) {৫.৫}	৩২৯০ (৯.৩) {২৩.৮}	৩৩৫০.৬ (৮.৪) {১.৮}

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে এবং { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

চিত্র ১৬: রাজস্ব আহরণের গতিধারা (জিডিপি'র %)

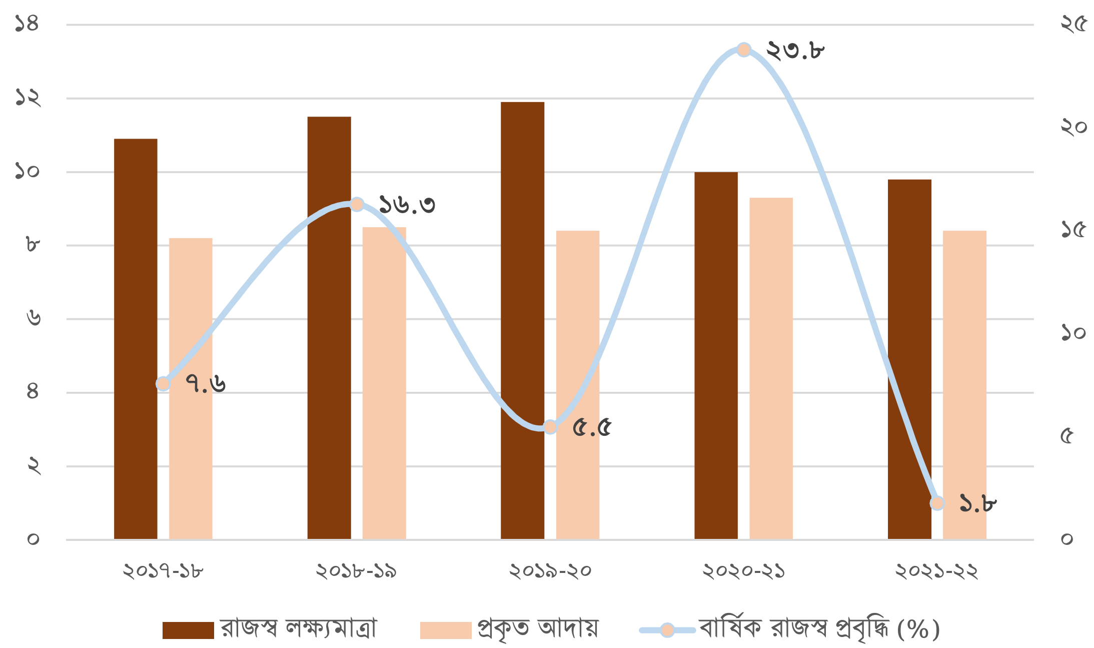

৩.৭ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহিত কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আহরণের প্রধান দুটি উৎস। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্বের ৮৭.৪% আদায় করে। কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে বিগত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট রাজস্বের যথাক্রমে ১৬.৫% ও ১৮% রাজস্ব আহরিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে এ হার ছিল ১০.৩%। কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে অধিক রাজস্ব আদায় হওয়ায় উক্ত বছর দুটিতে মোট রাজস্ব আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অংশ হ্রাস পায়। সরকারের সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে পড়ে থাকা অলস টাকা Treasury Single Account (TSA) এ আনা হয় যার ফলে ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে আদায়কৃত কর রাজস্বের পরিমাণ মোট রাজস্বের ২ শতাংশের বেশি নয়। এ ধরণের করের মধ্যে আছে মাদক ও মদ জাতীয় পণ্যের বিক্রি, যানবাহন, ভূমি উন্নয়ন এবং নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রি থেকে আদায়কৃত কর। রাজস্ব প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্ব ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। সরকার থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে প্রদত্ত ফী/ চার্জকে হালনাগাদ করাও জরুরি। অনেক ক্ষেত্রেই এই ফী/ চার্জ যুগের পর যুগ ধরে অপরিবর্তিত আছে। সরকার সাধারণ জনগণকে বিভিন্ন অপরিহার্য সেবা সাশ্রয়ী হারে দিতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু এই ফী/ চার্জগুলো বাস্তবতার নিরিখে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করাও জরুরি।

সারণি ৮: রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থবছর				
	২০১৭-১৮	**২০১৮-১৯**	**২০১৯-২০**	**২০২০-২১**	**২০২১-২২**
(ক) কর রাজস্ব (ক১ + ক২)	১৯৪৩.৩	২২৫৯.৬	২২১৮.৭	২৬৯৭.৯	২৯৯৫.৯
	(৮৯.৭)	(৮৯.৭)	(৮৩.৫)	(৮২.০)	(৮৯.৪)
	{৭.৪}	{৭.৭}	{৭.০}	{৭.৬}	{৭.৫}
(ক১) এনবিআর কর	১৮৭১	২১৮৬.২	২১৫৯.৩	২৬৩৭.৩	২৯২৮.৮
	(৮৬.৪)	(৮৬.৮)	(৮১.২)	(৮০.২)	(৮৭.৪)
(ক২) এনবিআর বর্হিভূত কর	৭২.২	৭৩.৪	৫৯.৪	৬০.৬	৬৭
	(৩.৩)	(২.৯)	(২.২)	(১.৮৪)	(২.০)
(খ) কর বর্হিভূত রাজস্ব (এনটিআর)	২২২.৩	২৫৯.২	৪৩৯.৩	৫৯১.৯	৩৫৪.৭
	(১০.৩)	(১০.৩)	(১৬.৫)	(১৮)	(১০.৬)
মোট রাজস্ব (ক + খ)	**২১৬৫.৬**	**২৫১৮.৮**	**২৬৫৮**	**৩২৮৯.৮**	**৩৩৫০.৬**

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের % এবং { } বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপির % নির্দেশ করে;

এনবিআর রাজস্বের বিভাজন

৩.৮ আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং শুল্ক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্বের প্রধান তিনটি খাত। বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১১.৬%। কোভিড চলাকালীন সময়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় ১.২% হ্রাস পেলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ২২.১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সম্পূরক শুল্ক আমদানি ও স্থানীয় দুই পর্যায়েই আদায় করা হয়। আরো কয়েকটা খাত আছে যেখান থেকে সামান্য রাজস্ব আদায় হয়। গত অর্থবছরে আয়কর এর প্রবৃদ্ধি এর আগের বছরের ১৫.৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ১০.১% এ দাঁড়িয়েছে। মূল্য সংযোজন কর এর প্রবৃদ্ধিও ২৯.৩% থেকে কমে ১৬.৪% এ নেমে এসেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানি শুল্কে ৩২.৭% প্রবৃদ্ধি হলেও ২০২১-২২ অর্থবছরে তা ৮.৮% এ নেমে এসেছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক এবং আয়কর খাত ২০২১-২২ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট রাজস্বের যথাক্রমে ৫৪.০% ও ৩২.৮.% রাজস্ব যোগান দিয়েছে। ভবিষ্যতে আয়কর ও মূল্য সংযোজন করই হবে রাজস্ব আদায়ের প্রধান দুটি খাত।

সারণি ৯: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

উৎস	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৫৯০.৩ (৩১.৬) {১২.৪}	৬৭২.৯ (৩০.৮) {১৪.০}	৭৫৩.৩ (৩৫.১) {১১.৯}	৮৭৩.৪ (৩৩.১) {১৫.৯}	৯৬১.২ (৩২.৮) {১০.১}
আমদানি শুল্ক	১৯৯.৯ (১০.৭) {-৩.৮}	২৪৪ (১১.২) {২২.১}	২৩৮ (১১.১) {-২.৫}	৩১৫.৯ (১২) {৩২.৭}	৩৪৩.৭ (১১.৭) {৮.৮}
মূসক ও সম্পূরক শুল্ক	১০৪৭.৩ (৫৬.০) {৬.৮}	১২৩৪.৪ (৫৬.৫) {১৭.৯}	১১২৪.৪ (৫২.৩) {-৮.৯}	১৪১৯.৩ (৩৯.২) {২৬.২}	১৫৮১.৮ (৫৪.০) {১১.৪}
অন্যান্য কর	৩৩.৬	৩৪.৯	৩২.৪	৩১.২	৪২

সূত্র: অর্থ বিভাগ; ( ) বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা এনবিআর কর রাজস্বের % নির্দেশ করে, { } বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে (%);

চিত্র ১৭: এনবিআর কর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির চিত্র (%)

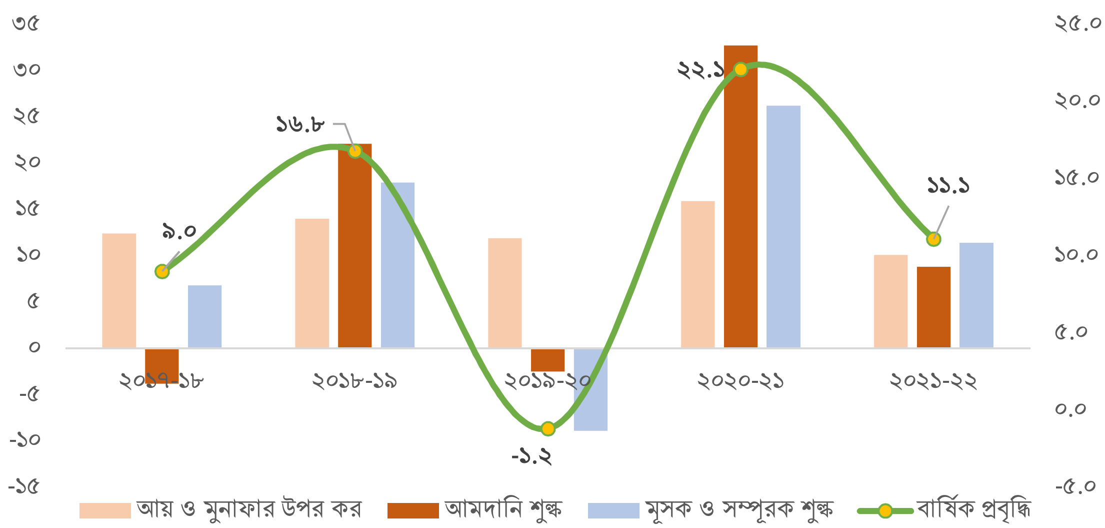

সূত্র: অর্থ বিভাগ

কর বহির্ভূত রাজস্বের বিভাজন

৩.৯ কর বহির্ভূত রাজস্বের (Non-Tax Revenue) প্রধান খাতগুলো হচ্ছে মুনাফা ও লভ্যাংশ, প্রশাসনিক ফি, জরিমানা, অর্থদন্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, পরিসেবা ফি, টোল, লেভি, অবাণিজ্যিক বিক্রয়, মূলধন প্রাপ্তি, এবং অন্যান্য কর ব্যতিত রাজস্ব। সরকার থেকে যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয় তার জন্য কিছু ফি আদায় করা হয়। সরকার সকল কর বহির্ভূত রাজস্বের রেট চার্ট এর অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করছে। এই অনলাইন ডাটাবেজ তৈরীর উদ্দেশ্য হচ্ছে কখন, কত বছর আগে এই ফি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের সাথে অনেক বছর আগে নির্ধারিত এই ফি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা বিশ্লেষণ করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা পুনঃনির্ধারণ করা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যুগ যুগ আগেই এই ফি/ চার্জ এর হার নির্ধারণ করা হয়েছে যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যধিক কম। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা ও লভ্যাংশ ১৬৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ফি থেকেও গত বছর আদায় ৪১.৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্বের মূল উৎস ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অলস অর্থ। 'স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানশিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান আইন-২০২০' বলবৎ হওয়ার কারণে উক্ত দুই অর্থবছরে এ খাতে জমা অনেক বেড়ে যায়। তবে ঠিক ভাবে ফি/ চার্জ এর হার নির্ধারণ ও মুনাফা ও লভ্যাংশ আদায় করা হলে ভবিষ্যতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর রাজস্বের ন্যায় কর বহির্ভূত রাজস্ব ও সরকারের আয়ের একটি প্রধান খাত হতে পারে।

সারণি ১০: কর বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মুনাফা ও লভ্যাংশ	১৯.৫ (-৩৯.৮)	২৬.৫ (৩৬.৪)	৩৪.৭ (৩০.৮)	১৯.০৯ (-৪৫.০)	৫০.১৯ (১৬৩)
প্রশাসনিক ফি	২৫.৭ (-৩৩.৯)	২৮ (৮.৮)	২৩.৮ (-১৫.০)	২০.৪ (-১৪.৩)	২৬ (২৭.৫)
সুদ	১৯.৯	১৫.১	১৯.১	৮০.৭	১৯.৫
জরিমানা	৬	৬.৯	৬	৮.৯	১২.৩
পরিসেবা ফি	৩৫.৫ (৫০৮.২)	৩৯.৬ (১১.৮)	২৯.৭ (-২৫.০)	৩২.৭ (১০.০)	৪৬.৩ (৪১.৬)
টোল/ লেভি	৬.১	৬.৮	৬.৮	৭.৯	১২.৬
অবাণিজ্যিক বিক্রি	১৭.৪	৯	১৭.৪	১৮.৭	৩২.৩
মূলধন প্রাপ্তি	৭	২.৬	১.৮	২.৫	৩
অন্যান্য আয় (কর রাজস্ব ব্যতিত)	১৫৮.৯	৭৯.৪	২৯৪.৩	৩৯০.২	১৫১.৬
মোট কর ব্যতিত রাজস্ব	২২২.৩ (-৪.০)	২৫৯.২ (১৬.৬)	৪৩৯.৩ (৬৩.৮)	৫৯১.৯ (৩৪.৭)	৩৬১.৭৬ (-৩৮.৯)

সূত্র: অর্থ বিভাগ; চিত্রে ( ) বার্ষিক বৃদ্ধি নির্দেশ করে (%);

সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

৩.১০ ২০২২-২৩ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোট ২.৩৬ ট্রিলিয়ন টাকা যা এ অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৫ শতাংশ। কোভিড পরবর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণে আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধি হলেও পরবর্তী বছরে তা কমে গেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি ১.৫%। আয়করে এ বছরে প্রথম আট মাসে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১০.৩% ও এনবিআর বর্হিভূত কর আদায়ে একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২২.৫%। যদিও এনবিআর এর অন্যান্য কর খাতে প্রবৃদ্ধি ৩২.৮%, তবে মোট রাজস্ব আদায়ে তার পরিমান খুব অল্প। ভবিষ্যতে মোট রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে আয়কর হচ্ছে সব থেকে সম্ভাবনাময় খাত। এ বছর মূল্য সংযোজন কর আদায়ে প্রবৃদ্ধি আছে কিন্তু আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আদায় কমে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে এ খাতে কোনো প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়নি। এ বছর আমদানি অনেক কমে যাওয়ায় আমদানি পর্যায়ে বিভিন্ন খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্বও কমে গেছে। সরকারকে বিরূপ আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যক নয় এধরণের পণ্য ও বিলাস পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করার পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এর ফলে আমদানি শুল্ক আদায় এ বছর কমে গেছে। কর বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) আরেকটা উল্লেখযোগ্য খাত যেখান থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে সামনে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

সারণি ১১: রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি ২০২২-২৩ অর্থবছর (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২২-২৩		২০২২-২৩ (জুলাই- ফেব্রু.)		২০২১-২২ (জুলাই- ফেব্রু.)	আট মাসের প্রবৃদ্ধি
	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার %	প্রকৃত আদায়	হার (%)
মোট রাজস্ব	**৪৩৩০**	**৪৩৩০**	**২৩৫৯**	**৫৪.৫%**	**২৩২৪**	**১.৫%**
কর রাজস্ব	৩৮৮০	৩৮৮০	২১০৯	৫৪.৪%	২১০৩	০.৩%
(ক) এনবিআর রাজস্ব	৩৭০০	৩৭০০	২০৫৬	৫৫.৬%	২০৬৩	-০.৩%
আয়কর	১২২১	১২২১	৬২০	৫০.৮%	৫৬২	১০.৩%
মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক	১৯৮৬.৯	১৯৮৭	১১২৮	৫৬.৭%	১১৫৪	-২.৩%
আমদানী শুল্ক	৪৪০	৪৪০	২৬৬	৬০.৫%	৩১৫	-১৫.৬%
অন্যান্য কর	৫২	৫২	৪৩	৮১.৬%	৩২	৩২.৮%
(খ) এনবিআর বর্হিভূত কর	১৮০	১৮০	৪৯	২৭.২%	৪০	২২.৫%
কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর)	৪৫০	৪৫০	২৫০	৫৫.৬%	২২১	১৩%

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৩.১১ কোভিড পরবর্তী সময়ে সাময়িকভাবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে আসে। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে যে রাজস্ব আদায়ের গতি অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে এসে বৃদ্ধি পায়। তাই ২০২২-২৩ অর্থবছরেও শেষ মাসগুলোতে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়ে এ অর্থবছরের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় হবে বলে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে রাজস্ব প্রশাসনে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ রাজস্ব প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তর, কর প্রদান সহজতর ও করবান্ধব করা, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর প্রশাসনের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও কার্যকরী সমন্বয় নিশ্চিত করা, কর অব্যাহতির যৌক্তিকীকরণসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও এর বাইরে কর ব্যতীত সরকারের অন্যান্য আয়ের উৎস (Non-Tax Revenue) থেকে আয় বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ে নির্ভরযোগ্য রাজস্ব প্রক্ষেপন এর প্রয়োজনীয়তা

৩.১২ মধ্যমেয়াদে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার কি পরিমান রাজস্ব আহরণ করতে পারে তার একটি সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আগামী বছরগুলোতে কর ও কর বহির্ভূত খাত থেকে আদায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে মধ্যমেয়াদে বাস্তবসম্মত ব্যয় ও ঘাটতি ব্যাবস্থাপনা করা কঠিন হবে। সুচারুরূপে বাজেট প্রণয়ন ও সরকারি অর্থের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য রাজস্ব পূর্ভাবাস প্রস্তুতের দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। সঠিকভাবে রাজস্ব প্রক্ষেপন তৈরীর জন্য এ বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান থাকার পাশাপাশি উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং রাজস্ব আহরণের সাথে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের জটিল যোগসূত্র ও কার্যকারণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

৩.১৩ নির্ভুলভাবে রাজস্ব প্রক্ষেপন করতে হলে নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি তথ্য না পাওয়া গেলে রাজস্ব প্রক্ষেপন করার জন্য "proxy" হিসাবে অন্য চলক ব্যবহার করা হয়, যেমন পরিবারের আয়, আমদানির পরিমান, পরিবারের খরচ ও জিডিপি'র আকার ইত্যাদি। রাজস্ব পূর্ভাবাস প্রস্তুত করতে অনেক ক্ষেত্রে কর স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) বা buoyancy ব্যবহার করা হয়। নির্ভরযোগ্য রাজস্ব পূর্ভাবাস করার জন্য একটি ইউনিট গঠন করতে গেলে এমন জনবল দরকার যাদের পূর্ভাবাস তৈরিতে দক্ষতা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে যেমন - রাজস্ব প্রশাসন, কোম্পানি আইন, পরিসংখ্যান, বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ও সামগ্রিকভাবে গবেষণার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকবে।

৩.১৪ আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ৫,০০০ বিলিয়ন টাকা রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা করছে। এ রাজস্বের বড় অংশ আসবে বিভিন্ন কর খাত থেকে। রাজস্ব আদায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ালে এবং কর প্রদান সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট করলে অনেক কোম্পানি ও ব্যক্তি করদাতা কর প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতে রাজস্বের বড় অংশই আসবে

প্রত্যক্ষ কর ও মূল্য সংযোজন কর থেকে। কর-জাল বিস্তৃতকরণ ও রাজস্ব প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বর্তমানে যে ব্যাপক কর অব্যাহতি দেয়া হয় তার যৌক্তিকীকরণ ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আরো স্বচ্ছতা আনয়ন করার জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ১২: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রক্ষেপণ		
মোট রাজস্ব	**৩৩৭৮**	**৪৩৩০**	**৪৩৩০**	**৫০০০**	**৫৮৭২**	**৭০৯৭**
		২৮.২%	*২৮.২%*	*১৫.৫%*	*১৭.৪%*	*২০.৯%*
কর রাজস্ব	৩০১৫	৩৮৮০	৩৮৮০	৪৫০০	৫৩৪৩	৬৪৬৩
		২৮.৭%	*২৮.৭%*	*১৬.০%*	*১৮.৭%*	*২১.০%*
এনবিআর কর	২৯৪৮	৩৭০০	৩৭০০	৪৩০০	৫০৯৫	৬১৭১
		২৫.৫%	*২৫.৫%*	*১৬.২%*	*১৮.৫%*	*২১.১%*
আয় ও লভ্যাংশ	১০১৪	১২৭৩	১২৭৩	১৪৮০	১৭৫৩	২১২৩
		২৫.৫%	*২৫.৫%*	*১৬.২%*	*১৮.৫%*	*২১.১%*
আমদানি শুল্ক	৮৭৪	১০৯৭	১০৯৭	১২৭৫	১৫১১	১৮৩০
		২৫.৫%	*২৫.৫%*	*১৬.২%*	*১৮.৫%*	*২১.১%*
মুসক ও সম্পূরক শুল্ক	১০৬০	১৩৩০	১৩৩০	১৫৪৫	১৮৩১	২২১৮
		২৫.৫%	*২৫.৫%*	*১৬.২%*	*১৮.৫%*	*২১.১%*
এনবিআর বহির্ভূত কর	৬৭	১৮০	১৮০	২০০	২৪৮	২৯২
		১৬৮.৭%	*১৬৮.৭%*	*১১.১%*	*২৪.০%*	*১৭.৭%*
এনটিআর	৩৬৩	৪৫০	৪৫০	৫০০	৫২৯	৬৩৪
		২৪.০%	*২৪.০%*	*১১.১%*	*৫.৮%*	*১৯.৮%*

সূত্র: অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে;

সারণি ১৩: রাজস্ব স্থিতিস্থাপকতা এবং বয়েন্সি (buoyancy)

	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)				
রাজস্ব-জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা	০.৯০	১.২৮	১.৪০	১.৬৫
কর রাজস্ব-জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা	০.৯৭	১.৩৩	১.৫০	১.৬৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব-জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা	০.৩৭	০.৯২	০.৪৭	১.৫৭
বয়েন্সি (Buoyancy)				
মোট রাজস্বের বয়েন্সি	০.৮২	১.৪৩	১.৬০	১.৯৭
কর রাজস্বের বয়েন্সি	০.৯৪	১.৪৯	১.৭৬	১.৯৮
কর বহির্ভূত রাজস্বের বয়েন্সি	-০.১৫	০.৮৭	০.১৭	১.৮৫

উৎস: অর্থ বিভাগ

৩.১৫ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অনুমিত রাজস্ব এবং পরবর্তী দুই বছরের প্রক্ষেপণ হতে দেখা যায় যে এ সময় রাজস্ব-জিডিপি স্থিতিস্থাপকতা এবং রাজস্ব বয়েন্সি'র (buoyancy) উচ্চ হার বিরাজ করবে যা মধ্যমেয়াদে শক্তিশালী রাজস্ব ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। প্রক্ষেপণ অনুসারে, কর বহির্ভূত রাজস্বের তুলনায় কর রাজস্ব অধিকতর স্থিতিস্থাপক এবং বয়েন্ট (buoyant) হবে। স্থিতিস্থাপকতা সংক্রান্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাজারমূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির তুলনায় মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ১.৬৫ গুণ হবে। অপরদিকে, বয়েন্সি (buoyancy) সংক্রান্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্থিরমূল্যে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির তুলনায় মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি ৯৮ শতাংশ বেশি হবে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণ কৌশল

৩.১৬ মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার সজাগ আছে। এর জন্য কর নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মধ্যমেয়াদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনকে কার্যকরী, দক্ষ ও করদাতা বান্ধব করা হবে। কর নিবন্ধন, রিটার্ন দাখিল ও কর প্রদান ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে এসকল প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সহজ ও করদাতা বান্ধব করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তা যাচাই-বাছাই করে যৌক্তিকীকরণ করা হবে। অভ্যন্তরীন ও আমদানি পর্যায়ে আদায়কৃত শুল্ক-কর ও এ সংক্রান্ত নীতি যাতে স্থানীয় শিল্পের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখে তাও নিশ্চিত করা হবে। বিগত কয়েক বছরে সরকারকে কোভিডসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। রাজস্ব আহরণ কাঙ্খিত পর্যায়ে বাড়াতে না পারলে সরকারের পক্ষে এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা দূরুহ হবে।

৩.১৭ সরকার কর-ব্যবস্থার সংস্কারের পাশাপাশি কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম নিচ্ছে। বিগত দেড় দশকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের আয় অনেক বেড়েছে এবং সরকার থেকেও এখন বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে। সরকার থেকে ইতোমধ্যে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ডিজিট্যাল ব্যবস্থায় নিজের বাড়িতে বসেই অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর ফলে মধ্যময়োদে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাত থেকে আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে যেখান সরকারের মালিকানা আছে সেখান থেকে আয় ও লভ্যাংশ বাবদ যাতে যথাযথ পরিমান অর্থ আদায় হয় তার জন্য এধরণের প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

কর ব্যয় (tax expenditure) - বর্তমান পরিস্থিতি

৩.১৮ বর্তমানে রাজস্ব আদায়ের হার দেশের জিডিপি'র আকৃতি ও প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়। এছাড়া বিনিয়োগ আকর্ষণে ও দেশীয় শিল্পের বিকাশেও কতিপয় ক্ষেত্রে কর সুবিধা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কর অব্যাহতি সুবিধা দেবার ফলে কত টাকা রাজস্ব আদায় কম হলো তার হিসাব করার জন্য কর ব্যয় নিরুপণ একটি উত্তম পন্থা। কর ব্যয় হচ্ছে নিরপেক্ষতা, দক্ষতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রণীত প্রমিত কর নীতির তুলনায় বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক কর সুবিধা দেবার ফলে কত টাকা কম রাজস্ব আদায় হলো তার একটি আনুমানিক হিসাব। কর অব্যাহতির তুলনায় কর ব্যয়ের ব্যাপ্তি বেশি। কর ব্যয়ের মধ্যে কর অব্যাহতিসহ হ্রাসকৃত কর হার, ট্যাক্স হলিডে, ট্যাক্স ক্রেডিট, দেরিতে কর পরিশোধের সুবিধা সহ সকল প্রকার কর সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হয়। বিভিন্ন কর সুবিধার ফলে কত টাকা রাজস্ব কম আদায় করা হলো তার বিশ্লেষণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ও কর আদায়ে স্বচ্ছতা আনয়নে ভূমিকা রাখে। তাই কর সুবিধার সুফল ও এর ফলে তৈরী পরোক্ষ অসুবিধাগুলো যাচাই করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশে কর ব্যয় নিরুপণ বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক) আয়কর:

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগ থেকে ২০২১ এ পাইলট ভিত্তিতে ব্যক্তি ও কর্পোরেট আয়কর এর ওপর একটি কর ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়। যদিও অল্প তথ্যের ভিত্তিতে ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার মাঝে স্বল্প পরিসরে এই পর্যালোচনা করা হয় কিন্তু এর ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে দেখা যায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রায় ৩৬% আয়কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল। টাকার অংকে এর পরিমান আনুমানিক ৫৮ হাজার কোটি টাকা। যদি এই অব্যাহতির সাথে জমির মালিকানা হস্তান্তর থেকে প্রাপ্ত capital gain (জিডিপি'র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত নয়) কে গনা হয় তাহলে আরো ৮ হাজার কোটি টাকা যোগ হবে। জিডিপিতে এর পরিমান প্রায় ২.৬%। সরকার কাঙ্খিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যেমন নতুন চাকরির সংস্থান, সুলভে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধা প্রদান, অসমতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যে বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করে। বিভিন্ন কর অব্যাহতি

সুবিধা বিশ্লেষণ করা হলে এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ও কত রাজস্ব কম আদায় হলো তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়।

খ) মূল্য সংযোজন কর:

জিডিপি'র বিভিন্ন খাত, যেমন কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা সেবা, মাৎস্য, পশু সম্পদ (জিডিপি'র ২১.২%) মূল্য সংযোজন কর এর আওতা বহির্ভূত। উৎপাদন খাতে অনেক শিল্প, যেমন – গৃহস্থালি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভোগের পন্য, ওষুধ, কম্পিউটার সামগ্রী ও উপকরণ, রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতি দেয়া আছে। রপ্তানি বাড়ানো, স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য এই অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর ফলে জিডিপি'র আরো প্রায় ২৩% মূসক আদায় থেকে বাদ পড়লো। পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ের (জিডিপি'র ১৫%) একটি বড় অংশও মূসক থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। পরিবহন সেবার (জিডিপি'র ৭.৫%) প্রায় পুরোটা থেকেই কোন মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয় না যাতে সাধারণ জনগণের জন্য পরিবহন খরচ সহনীয় পর্যায়ে থাকে। এ বছরের রাজস্ব সম্মেলনে মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক একটি উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৫০% পণ্য ও সেবার ওপর কোন মূল্য সংযোজন কর আদায় করা হয় না।

গ) শুল্ক:

ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কর থেকে তুলনামূলকভাবে কম রাজস্ব আহরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্ব আহরণে এ খাতের অবদান কম নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগের তথ্য অনুসারে ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাংলাদেশে মোট আমদানির খাতওয়ারি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৫% আমদানি হয়েছে শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বারা, ৭.৪% আমদানি করেছে EPZ এর প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং ১৯.৮% আমদানি হয়েছে বিভিন্ন এসআরও/ আদেশের বিশেষ ছাড়ের সুবিধা নিয়ে। অর্থাৎ, ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট আমদানির ৪২.৩% আমদানিতে কোন শুল্ক কর আদায় হয়নি বা হ্রাসকৃত হারে শুল্ক কর আদায় করা হয়েছে।

৩.১৯ উপরের আলোচনা থেকে এ ধারণায় উপনীত হওয়াা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও খাতকে দেয়া কর অব্যাহতি সুবিধার অধিকতর বিশ্লেষণ ও কর অব্যাহতির সুবিধা – অসুবিধা বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন আছে। কর অব্যাহতির অধিকতর বিশ্লেষণের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কর ব্যয় বিশ্লষণ করা এবং এর জন্য আয়কর ও মূল্য সংযোজন করের জন্য প্রমিত কর হার (benchmark tax rate) ও করের ভিত্তি নির্ধারণ করা। এর সাথে সাথে পর্যাপ্ত ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কর আদায়কারী বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একসাথে কাজ করার মানসকিতা তৈরী অত্যাবশ্যক। আয়কর, মূসক ও শুল্কে কি কি ক্ষেত্রে অব্যাহতি সুবিধাা দেয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত কর হারের বা বিশেষ কর সুবিধা প্রদান করা হয় তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করাও জরুরী। বর্তমানে কর অব্যাহতির যে ধারা চলমান আছে তার যৌক্তিকীকরণ

করা হলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হবে অন্য দিকে প্রদত্ত কর অব্যাহত সুবিধার (যা পরোক্ষভাবে সরকারের ব্যয়) সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম

৩.২০ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তিন ধরণের পদক্ষেপ নিচ্ছে: কর ব্যবস্থার ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, কর-জাল সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব প্রশাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। মূল ভাবনা হচ্ছে কর প্রদান প্রক্রিয়াকে সহজতর ও স্বচ্ছ করা যাতে করদাতা উন্নত মানের সেবা পান এবং এর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে অধিকতর রাজস্ব আহরণ সম্ভব হয়। সরকার থেকে রাজস্ব খাতে উল্লখেযোগ্য যে সকল সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো:

ক. নতুন আইন ও বিধি প্রণয়ন

- *মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়নঃ* আইনটি জুলাই ২০১৯ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইনটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পর মধ্যমেয়াদে মূল্য সংযোজন কর এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আদায় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোভিড অতিমারির দুই বছর মূসক আদায় তেমন বৃদ্ধি না পেলেও পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মূসক আদায়ে ভালো প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

- *নতুন শুল্ক আইন প্রণয়ন:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নতুন শুল্ক আইনের খসড়া চুড়ান্ত করেছে যা ১৯৬৯ সালের শুল্ক আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। নতুন শুল্ক আইনটি ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন, সংশোধিত কিয়োটো কনভেনশন এবং ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিম্যান্ট এ উল্লেখিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন আইনে শুল্ক কর আদায়ের পদ্ধতি আরো উন্নত ও সহজতর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- *নতুন আয়কর আইন:* নতুন আয়কর আইন ইতোমধ্যে ক্যাবিনেট কমিটি থেকে অনুমোদিত হয়ে মহান সংসদে উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে। নতুন আইনটির খসড়া সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। নতুন আইনটি কর ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে।

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোগত সংস্কার ও আধুনিকায়ন:

- *ভ্যাট ব্যবস্থার অটোমেশন:* নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন বাস্তবায়নের জন্য ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট (VoP) ২০১৩ থেকে চালু হয় এবং প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অটোমেশনের কাজ করা হয়েছে: প্রথমত, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন মার্চ ২০১৭ থেকে শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে জুলাই ২০১৯ থেকে।

তৃতীয়ত, ২০১৯ এর জুলাই থেকে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন জমা দেওয়া যাচ্ছে। এর ফলে মূসক প্রশাসনে ডিজিটাল ফাইলিং সিস্টেম চালু হয়েছে।

- *ই-পেমেন্ট:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর প্রদান সহজ করতে ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম (ই-পেমেন্ট) পদ্ধতি চালু করেছে, যার আওতায় ২০১৭ সাল থেকে শুল্ককর, ২০১২ সাল থেকে আয়কর এবং জুলাই ২০১৯ থেকে মূসক প্রদান করা যাচ্ছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়্যাল সার্ভিসেস এর মাধ্যমে আয়করও পরিশোধ করা যাচ্ছে। বারটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে একাউন্ট রয়েছে এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানি ব্যাংকে না গিয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতেই মূসক প্রদান করতে পারেন। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়ে RTGS (Real Time Gross Settlement) এর মাধ্যমে মূসক পরিশোধ করা হয় এবং এর তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের IVAS (Integrated Vat Administration System) এ প্রেরণ করা হয়। করদাতা IVAS থেকে কর পরিশোধের মেসেজ পান।

- *এ- চালান প্রচলন:* সরকারি কোষাগারে রাজস্ব সরাসরি জমা হওয়ার সুবিধার্থে Automated Challan (A-Challan) চালু করা হয়েছে। আয়কর বিধি ১৯৮৪ এর বিধি ২৬এ অনুসারে সকল আয়কর পরিশোধের জন্য এ-চালান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক ও মূসক পরিশোধের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি প্রবর্তন করতে আগ্রহী। এ-চালানের ফলে ভূয়া রিটার্ন জমা ও রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সম্ভব। এছাড়াও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং নিরীক্ষা দপ্তরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা দূর করতে এ-চালান পদ্ধতি সহায়ক হবে।

- *অনলাইনে কর রিটার্ন দাখিল:* ব্যক্তি করদাতাগণ তাদের আয়কর রিটার্ন https:// etaxnbr.gov.bd এ জমা দিতে পারেন। এবছর ০.৩ মিলিয়ন এর অধিক ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা তাদের আয়কর রিটার্ন অনলাইনে জমা দিয়েছেন। এটাকে এসআরও দিয়ে আইনে পরিণত করা হয়েছে।

- *ইলেক্ট্রনিক ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স (ই-টিডিএস):* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর কর্তন সহজ করার জন্য ই-টিডিএস এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (https:// etds.gov.bd/login) চালু করেছে। এ প্ল্যাটফর্ম চালু হওয়ার ফলে করদাতাগণের সময় বেঁচেছে এবং কর দেবার জন্য কোন অফিসে যেতে হচ্ছে না।

- *ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি):* মূসক আদায়ে ফাঁকি রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস ও সেলস ডাটা কন্ট্রোলার (এসডিসি) মেশিন ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, ফাস্ট ফুডের দোকান, মিষ্টির দোকান, ডেকোরেটর ইত্যাদিসহ ২৪টি সেক্টরের প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৯,২৭০টি ইএফডি/ এসডিসি স্থাপন করা হয়েছে। আরো বেশী সংখ্যায় ইএফডি মেশিন স্থাপনের জন্য সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করেছে। প্রথম পর্যায়ে ষাট হাজার এবং আগামী পাঁচ বছরে তিন লক্ষ ইএফডি

মেশিন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তারা কাজ করবে। এছাড়াও যেসব মূসক নিবন্ধিত ফ্যাক্টরিতে বার্ষিক টার্নওভার পাঁচ কোটি টাকা বা তার থেকে বেশী তাদের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অনুমোদিত মূসক সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- *অনিবাসী কোম্পানির মূসক অনুমোদিত ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ:* Google, Facebook, Microsoft এর ন্যায় ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনলাইনে প্রদত্ত সেবার ওপর প্রদেয় মূসক তাদের নিজ নিজ ভ্যাট এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে অফিস না খুলেও এ ধরণের প্রতিষ্ঠান প্রদেয় মূসক অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছে।

- *সেন্ট্রাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফিস:* সমুদ্র ও বিমানবন্দর দিয়ে আমদানিকৃত পণ্য চালান দ্রুত খালাসের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে অনুর্দ্ধ ১০ শতাংশ পণ্য সরেজমিনে পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করে বাকি পণ্য দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করতে কেন্দ্রীয়ভাবে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট স্থাপন করা হয়েছে।

- *অটোমেটেড বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:* বন্ড ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জুন ২০২৩ এর মধ্যে এ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু হওয়ার আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে লাইসেন্সিং মডিউল চালু করা হয়েছে।

- *টাইম রিলিজ স্টাডি:* শুল্ক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন্দরগুলোতে আমদানিকৃত পণ্য চালানের খালাস দ্রুত করার লক্ষ্যে বর্তমানে কী কারণে খালাস প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটে তা জানার জন্য টাইম রিলিজ স্টাডি করার উদ্যোগ নিয়েছে। পণ্য চালান দ্রুত খালাসে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি তা চিহ্নিতকরণ এবং কিভাবে চালান খালাসের সময় কমানো যায় তার জন্য এ উদ্যোগ থেকে সুপারিশ করা হবে।

- *করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশব্যাপী কর মেলা আয়োজন ও সমীক্ষার মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সকল করদাতা সনাক্তকরণ নম্বরধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত টিআইএন-ধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষের বেশি। সর্বমোট ৩২ লক্ষ রিটার্ন এপ্রিল ২০২৩ এর মধ্যে দাখিল করা হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি।

- *ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেম (ডিভিএস):* জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাধ্যতামূলকভাবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সিস্টেমে অনলাইনে জমা দেওয়ার বিধান করেছে। এর ফলে বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদনে ভুল তথ্য দেওয়ার প্রবনতা কমবে, স্বচ্ছতা বাড়বে এবং আয়কর আদায় বৃদ্ধি পাবে।

- *অন্যান্য সংস্কার:* জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যান্য চলমান সংস্কারের মধ্যে আছে: (১) ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো, পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট, এডভান্সড রুলিং, অথোরাইজেড ইকোনমিক অপারেটর, ইত্যাদির বাস্তবায়ন ও অপারেশনাইলেশন এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন; (২) এসজিএমপি প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর জমাদান ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন; (৩) আয়কর কর্তনে নিরীক্ষণ জোরদার করতে "Individual Source Tax Deduction Monitoring Zone" এর বাস্তবায়ন; (৪) আয়করে ই-পেমেন্টে এর ব্যপ্তি সম্পসারণ, (৫) ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং বিরোধী কার্যক্রম সম্প্রসারণ; (৬) আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রম জোরদার করা; (৭) আয়কর বিভাগের প্রশাসনিক সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

গ. স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ্য মোকাবিলায় ট্যারিফ যোক্তিকীকরণ:

- বাংলাদেশের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর হার WTO তে বাংলাদেশের অঙ্গীকার (bound rate) অনুসারে কমিয়ে আনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করছে। ইতোমধ্যে ৬টি ট্যারিফ লাইনের শুল্ক হার হ্রাস করা হয়েছে এবং আরও ৬০টি ট্যারিফ লাইন চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে শুল্ক-করহার বেশি আছে। এ সকল ট্যারিফ লাইনে শুল্ক-করহার পর্যায়ক্রমে ২০২৬ এর মধ্যে কমিয়ে আনা হবে। সরকার সর্বনিম্ন আমদানি মূল্য (minimum import price) প্রত্যাহারেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৫টি পণ্যের ওপর সর্বনিম্ন আমদানি মূল্য (minimum import price) প্রত্যাহার করা হয়েছে ও বাকী ১৩০টি পণ্যের ওপর ২০২৬ এর মধ্যে প্রত্যাহার করা হবে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান অক্ষুন্ন রেখে ভবিষ্যতে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য কিভাবে শুল্ক-কর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা যায় তার জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। ব্যবসা ও করবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং রপ্তানি স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি রাজস্ব স্বার্থও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

ঘ. কর বহির্ভূত রাজস্বের সম্ভাবনা অন্বেষণ

- *কর বহির্ভূত রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত সকল সেবার ও তার জন্য নির্ধারিত চার্জ/ ফির তালিকা তৈরি:* সরকার থেকে অনেক ধরণের সেবা প্রদান করা হয়। এ সব সেবার কোন তালিকা বা কোন সেবার জন্য কত টাকা চার্জ/ ফি প্রদান করতে হয় এবং কোন সালে এই চার্জ/ হার নির্ধারণ করা হয়েছে তার কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা নাই। একটি অনলাইন ডাটাবেস করার জন্য সরকার থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যেখানে কোন সেবার জন্য কত টাকা সার্ভিস চার্জ/ ফি দিতে হয় এবং কখন এই হার নির্ধারণ করা হয়েছিল তার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ আছে। এই ডাটাবেস থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রশাসনিক ফি/ চার্জেস সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। এর ফলে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে সরকারের আয় বহুগুন বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হবে।

- *সরকারি সেবার ডিজিটালাইজেশন*: সরকার বিভিন্ন সেবার ফি/ চার্জ হালনাগাদকরণের পাশাপাশি গুণগতমান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করছে। সরকারের প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা অনলাইনে কোন কাগজের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তরে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াও যাতে এই সেবা নেয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০৪১ এর মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশে গঠনে এ ধরণের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

- *সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও আয়ের তালিকা প্রস্তুতকরণ:* সরকার বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করেছে ও ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগ করছে। সরকার যে টাকা ঋণ দিয়েছে তা সরকারি হিসাবে Subsidiary Loan Agreements (SLAs) হিসোবে অন্তর্ভূক্ত আছে এবং সেখানে সুদ আরোপ করা হয়। তবে সরকারের বিভিন্ন প্রতিস্ঠানে ইক্যুয়িটিতে বিনিয়োগের কোন পরিপূর্ণ তালিকা নাই। এর ফলে কোন খাত থেকে কত টাকা মুনাফা/ লভ্যাংশ আয় হতে পারে তা অনুমান করা সম্ভব হয়না। এ বিষয়ে সরকার বিভিন্ন প্রতিস্ঠানে বিনিয়োগের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবৃতি যাতে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় এবং তারা যাতে প্রমিত আর্থিক বিবৃতি অনুসরণ করে সেজন্য Financial Reporting Council ব্যবস্থা নিতে পারে।

- *কর বহির্ভূত রাজস্বের জন্য নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান:* বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সরকার থেকে প্রদত্ত সেবার পরিধি ও ব্যপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন নতুন সেবা যুক্ত করা হচ্ছে। নতুন নতুন আংগিকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার বিপরীতে যৌক্তিকভাবে সার্ভিস চার্জ/ ফি কত ধার্য করা যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সরকার সিদ্ধান্ত নিবে। এছাড়াও, এ ধরণের প্রতিষ্ঠান যাতে তাদের আর্থিক বিবৃতিতে সঠিকভাবে তথ্য উপস্থাপন করে তার জন্য Financial Reporting Council থেকে প্রমিত আর্থিক বিবৃতি তৈরী করে দেয়া হচ্ছে।

৩.২১ বর্তমানের উন্নত দেশগুলো যখন বাংলাদেশের উন্নয়নের সমপর্যায়ে ছিল তখন তাদের কর-জিডিপি হার বাংলাদেশের বর্তমান কর-জিডিপি হারের সমজাতীয় ছিল[1]। তবে বর্তমানের তুলনীয় ও সমজাতীয় অন্যান্য দেশ থেকে বাংলাদেশ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে আছে। বেশ কয়েকটি অনুঘটক এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কম রাজস্ব আহরণের পিছনে ভূমিকা রেখেছে। সরকার চেষ্টা করছে যাতে কর আদায় সহজ, স্বচ্ছ ও নির্ঝঞ্ঝাট করা যায়। রাজস্ব সংক্রান্ত বিধি-বিধান সহজবোধ্য করার ও রাজস্ব প্রশাসনকে করদাতা বান্ধব করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে কর দাতা নিজ থেকেই কর প্রদানে উৎসাহিত বোধ করেন।

[1] সূত্র: Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2014. "Why Do Developing Countries Tax So Little?" *Journal of Economic Perspectives*, 28 (4): 99-120

৩.২২ রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর আদায়কারী বিভিন্ন বিভাগ, যেমন - মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর প্রশাসন, এর মধ্যে এক সাথে কাজ করার প্রচেষ্টা ও তথ্যের আদান প্রদানের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ গ্রহণ, কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে আরো ন্যায়নিষ্ঠ ও কৌশলী হওয়া, এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও আধুনিক কৌশলের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সরকার রাজস্ব আদায় বাড়াতে গেলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি করদাতা, এবং অন্যান্য অংশীজনদের সহযোগিতা অপরিহার্য। বাংলাদেশের সরকার সামগ্রিকভাবে রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও করবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গড়ার জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।

চতুর্থ অধ্যায়
সরকারি ব্যয়, খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার ও ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.১ বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে আসীন হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। পরিকল্পিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৫) সাথে সমন্বয় করে ব্যয় এবং খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। ২০১৬-২০১৯ সময়ে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল দেশগুলোর একটি এবং প্রবৃদ্ধির এ দ্রুত গতি অর্থনীতির রূপান্তরকে উন্নয়নের 'টেক-অফ পর্যায়ে' পৌঁছে দিয়েছে। যেহেতু কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবগুলো প্রশমিত হয়েছে এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রাথমিক প্রভাবগুলি ম্লান হতে শুরু করেছে, তাই সরকার এখন কোভিড-পূর্ব প্রবৃদ্ধির গতিতে ফিরে যাওয়া এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার একটি মধ্যমেয়াদি সরকারি ব্যয় কৌশল প্রণয়ন করেছে যাতে করে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান এবং সম্পদের বণ্টনের মাধ্যমে দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।

৪.২ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালীন সরকার জনজীবন রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের পাশাপাশি মানুষের জীবিকা সুরক্ষার দিকেও গভীর নজর দিয়েছিল। এ দু'য়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। সরকার সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে স্বাস্থ্য, কৃষি, সমাজকল্যাণ, খাদ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কর্মসংস্থান সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষে অর্থনীতি তার স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির গতিপথে ফিরে আসে। তবে, বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপের কারণে সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয়কে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। ইতোমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থার কারণে উক্ত চাপ দৃশ্যতঃ প্রশমিত হচ্ছে; তাই অদূর ভবিষ্যতে সরকার প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর কৌশল গ্রহণ করবে। আসন্ন বাজেটে সরকারের মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্রবান্ধব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কৌশল গ্রহণ, দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকে সচল করা, সরকারি বিনিয়োগ কার্যক্রম জোরদার, মূল্যস্ফীতির চাপ কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপ কমানো।

৪.৩ এ অধ্যায়ে সরকারি ব্যয়, খাতভিত্তিক ব্যয় প্রবণতার সাম্প্রতিক ধারা, বিভিন্ন খাতের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে সম্পদ বরাদ্দের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে ঋণের গঠন বিবেচনায় নিয়ে ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলোও বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যয় যৌক্তিকীকরণ, রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি, এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন, ঋণ সংক্রান্ত খরচ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণের পরিপক্কতা (Maturity) পরিবীক্ষণ এবং অর্থায়ন উৎসের বহুমুখীতা নিশ্চিতকরণ। অধ্যায়টিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয়ের সম্ভাব্য ধরন এবং পূর্বাভাসের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারি ব্যয় নির্বাহের চিত্র

৪.৪ বর্তমানে সরকারের অগ্রাধিকার হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক উচ্চ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে অনুযায়ী মধ্যমেয়াদি সরকারি ব্যয় কৌশল (২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর) প্রণয়ন করা হয়েছে। কৌশলটিতে রূপকল্প-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সঙ্গতি রেখে অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাজেট প্রণয়নে সরকার অগ্রাধিকার খাতে ব্যয়ের ওপর জোর দিচ্ছে; বিশেষ করে, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নসহ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তবে, এটি লক্ষ্যনীয় যে অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশে জিডিপি'র শতাংশে সরকারি ব্যয়ের আকার এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এ অবস্থায় সরকারি ব্যয় বাড়ানোর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করাই সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

চিত্র ১৮: জিডিপির অনুপাতে সরকারি ব্যয় (২০২২, শতকরা হার)

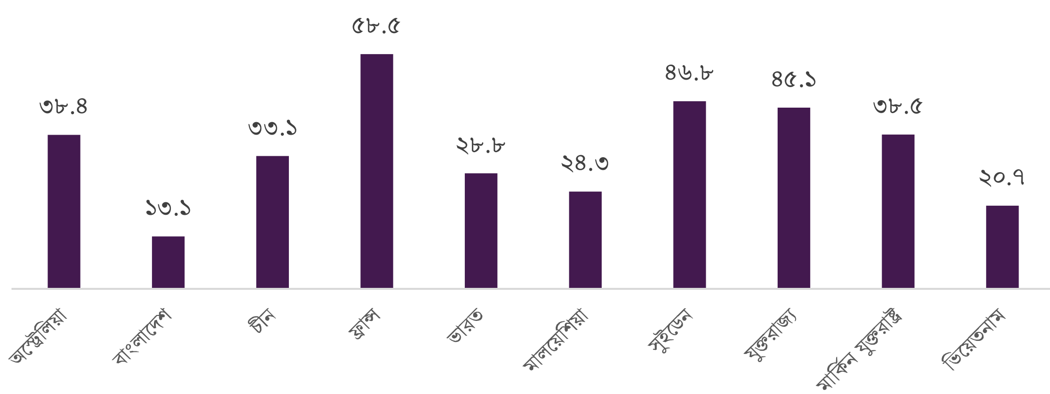

সূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরাম, আইএমএফ (এপ্রিল ২০২৩) ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

সরকারি ব্যয়ের মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৪.৫ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি ব্যয় ছিল জিডিপির ১১.৫ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকার পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সংস্কারের সফল বাস্তবায়ন বিবেচনায় নিয়ে তার ব্যয় বাড়ানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করে। সময়ের সাথে সাথে জিডিপির অনুপাতে সরকারের ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজেট ঘাটতি সহনীয় মাত্রায় রাখতে সরকার অত্যন্ত তৎপর থাকায় মোট ঋণ পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রয়েছে।

চিত্র ১৯: মোট সরকারি ব্যায়ের (জিডিপির শতকরা হারে)

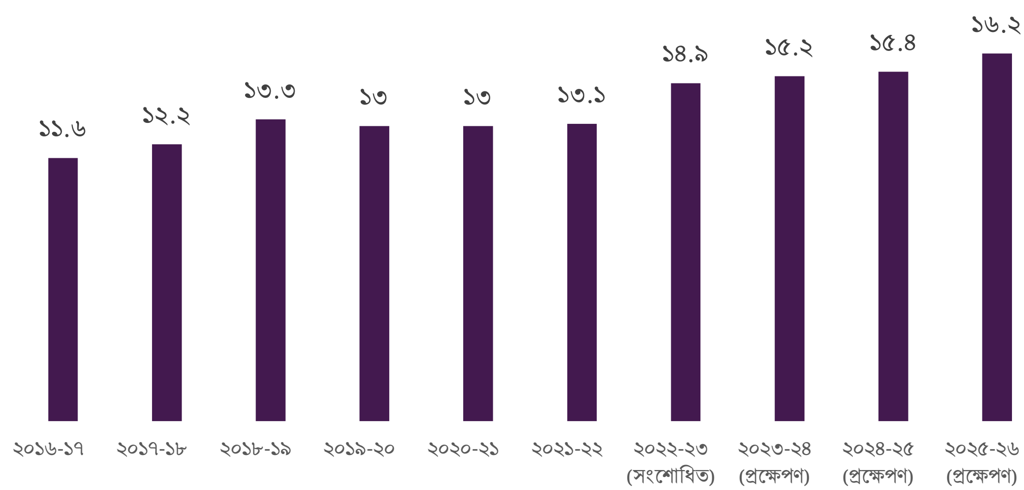

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

আবর্তক ও মূলধন ব্যয়

৪.৬ সরকারি ব্যয়ের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী বাজেটের বরাদ্দ মূলত: দু'টি ভাগে বিভক্ত- আবর্তক ব্যয় ও মূলধন ব্যয়। আবর্তক ব্যয়ের প্রধান প্রধান অংশগুলো হলো সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি, পণ্য ও সেবা ক্রয়, ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ এবং 'খাদ্য হিসাব' ব্যয়। অন্যদিকে, মূলধন ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে উৎপাদনশীল সম্পদের সংযোজন এবং নতুন সৃষ্টি। মূলধন ব্যয়ের অন্যতম প্রধান দুটি ধারা হচ্ছে - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়। এছাড়া, ঋণ ও অগ্রিম, রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও হস্তান্তর ব্যয়ও মূলধন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

৪.৭ অর্থনীতিতে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে দেশের মানুষের সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে আবর্তক ব্যয় ও মূলধন ব্যয়ের মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য সাধন বেশ জরুরি। আবর্তক ব্যয়ে বাজেটে বরাদ্দ প্রদানে সরকার কেমন অগ্রাধিকার দিতে পারে- এ বিষয়ক বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উন্নত দেশগুলো ভর্তুকি ও হস্তান্তর খাতে, এবং অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলো সামাজিক ও কমিউনিটি'র পরিষেবার মান উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদানে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আরও দেখা যায় যে, হস্তান্তর খাতে বরাদ্দ দিয়ে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক হয়ে থাকে।[২] তবে সরকারি বিনিয়োগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং এর মাধ্যমে উৎপাদনশীল সম্পদ তৈরি করতে মূলধন ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা দরকার। সারণি ১৪ হতে দেখা যায়, বাজেটের শতকরা হারে মূলধন খাতে বরাদ্দ বিভিন্ন বছরে হ্রাস/বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিকভাবে চলমান অর্থবছরের তুলনায় মধ্যমেয়াদে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে, আবর্তক ব্যয় খাতে মধ্যমেয়াদে বরাদ্দ হ্রাস পাবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে আবর্তক ব্যয় মোট বাজেটের ৫৯.১ শতাংশ, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে হ্রাস পেয়ে ৫৮.৭ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মূলধন ব্যয় মোট বাজেটের ৪০.৯ শতাংশ, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে ৪১.৩ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সারণি ১৪: সরকারি ব্যয়ের বিভাজন (বাজেটের শতকরা হারে)

	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত			সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
আবর্তক ব্যয়	৫৬.৭	৫৭.৯	৫৯.৪	৫৯.১	৫৭.৩	৫৮.৩	৫৮.৭
মূলধন ব্যয়	৪৩.৩	৪২.১	৪০.৬	৪০.৯	৪২.৭	৪১.৭	৪১.৩

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.৮ সারণি ১৫ -এ সরকারি মোট ব্যয়ের বিভাজন জিডিপি'র শতাংশে দেখানো হয়েছে। এ সারণি থেকে দেখা যায়, ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের সময়কালে বাজেটের অংশ হিসেবে আবর্তক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত: কোভিড এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের যুগপৎ অভিঘাত হতে উদ্ভূত সংকটের সময় সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ গ্রহণের কারণে আবর্তক ব্যয় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের মূলধন ব্যয়ের মূল অংশ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল জিডিপি'র ৪.৫ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে কিছুটা বৃদ্ধি

[2] Obi, C. K. (2020). Government recurrent expenditure effect on economic growth: evidence from expenditure on some selected variables. *Acta Universitatis Danubius. Œconomica*, *16*(1), 228-237.

পেয়ে জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ব্যয় নির্ধারণ জিডিপি'র ৫.১ শতাংশ করা হয়েছে।

সারণি ১৫: সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ বিভাজন (জিডিপির %)

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত					সংশোধিত
আবর্তক ব্যয়	৬.৮	৭.৪	৭.৪	৭.৫	৭.৭	৮.৮
বেতন ও ভাতাদি	১.৮	১.৮	১.৭	১.৭	১.৬	১.৬
পণ্য ও সেবা	০.৯	১.০	০.৯	০.৯	০.৮	০.৯
সুদ পরিশোধ	১.৬	১.৭	১.৮	২.০	২.০	২.০
অভ্যন্তরীণ	১.৪	১.৬	১.৭	১.৯	১.৮	১.৮
বৈদেশিক	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১	০.২
ভর্তুকি ও স্থানান্তর ব্যয়	২.৫	২.৯	২.৯	২.৯	৩.৪	৪.২
থোক বরাদ্দ	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০	০.১
খাদ্য হিসাবের স্থিতি	০.৩	০.১	০.১	০.১	০.১	০.১
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৫	৫.০	৪.৮	৪.৫	৪.৭	৫.১
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ও নিট ঋণ	০.৬	০.৮	০.৭	০.৮	০.৬	০.৯
এডিপি বহির্ভূত মূলধন ব্যয়	০.৬	০.৮	০.৮	০.৮	০.৭	০.৯

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৪.৯ বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়কালে আবর্তক ব্যয় ছিল গড়ে জিডিপি'র প্রায় ৭.৪ শতাংশ। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী তা বেড়ে ৮.৮ শতাংশ হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আবর্তক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৯.৫ শতাংশে দাঁড়াবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২০: আবর্তক ব্যয়ের গতিধারা ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপির %)

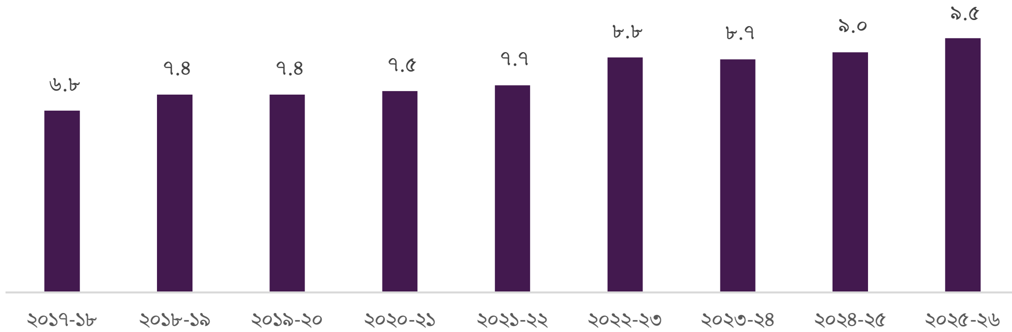

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বেতন ও ভাতাদি

৪.১০ সরকার কার্যকর ও দক্ষ জনসেবা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বেতন-ভাতাদি খাতের ব্যয় যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পেনশন সুবিধাসহ সমস্ত বেতন এবং ভাতাদি প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) বাস্তবায়নের ফলে পেমেন্ট সিস্টেম শক্তিশালী হয়েছে এবং অযাচিত ব্যয় থেকে মুক্ত হয়েছে। এতে মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে বেতন এবং ভাতাদি খাতের ব্যয় হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় ছিল মোট ব্যয়ের ১৪.৯ শতাংশ, যা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে দাঁড়িয়েছে মোট ব্যয়ের ১২.১ শতাংশে। মধ্যমেয়াদে এটি আরও কমবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য বেতন এবং ভাতাদি বাবদ ব্যয় মোট বাজেটের ১০.৬ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

চিত্র ২১: বেতন ও ভাতাদি বাবদ ব্যয় (মোট ব্যয়ের %)

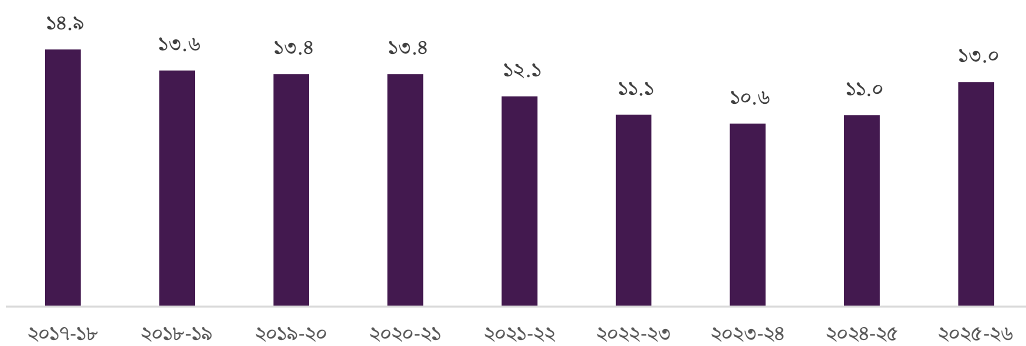

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

পণ্য ও পরিষেবায় সরকারি ব্যয়

৪.১১ বিপননযোগ্য ও অবিপননযোগ্য উভয় ধরণের পণ্য সরবরাহ ও পরিষেবা প্রদানের জন্য সরকার যে সকল কাঁচামাল ও সেবা ক্রয় করে থাকে তার সকল ব্যয় পণ্য ও পরিষেবায় সরকারি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। সরকারি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ই-জিপি সিস্টেমের প্রচলন, সরকারি অফিসের জন্য ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের ডিজিটালাইজেশন, সরকারি ভ্রমণ ব্যয় পরিশোধের অর্থ প্রদানের জন্য ইএফটি সিস্টেম এবং অন্যান্য ই-পেমেন্ট প্রক্রিয়া চালুকরণসহ সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা বাস্তবায়নের ফলে একটি দক্ষ ও কার্যকর ব্যয় ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর সময়কালে মোট ব্যয়ের শতাংশ হিসাবে পণ্য ও পরিষেবা খাতের গড় ব্যয় ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ খাতের জন্য মোট ব্যয়ের ৫.৯ শতাংশ সংস্থান রাখা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে এ খাতের ব্যয় সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতের ব্যয় মোট বাজেটের ৫.৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ উন্নীত হবে।

সারণি ১৬: পণ্য ও পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয়

	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
	প্রকৃত		সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
পণ্য ও পরিষেবা ব্যয় (বিলিয়ন টাকায়)	৩০৪.৬	৩১৭.৭	৩৮৯.৫	৪৪২.৩	৬৩৬.২	৭৮০.০
মোট ব্যয়ের %	৬.৬	৬.১	৫.৯	৫.৮	৭.৩	৭.৬

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ভর্তুকি ও হস্তান্তর ব্যয়

৪.১২ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দারিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার ভর্তুকি ও হস্তান্তর খাতে ব্যয় বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকা সহায়তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নিয়মিত মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভর্তুকি ধীরে ধীরে হ্রাসপূর্বক ভর্তুকি ব্যয় যৌক্তিকীকরণে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রতিবছরই খাদ্য, সার, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন এবং অন্যান্য কিছু খাতে ভর্তুকি দেওয়া হয়। অন্যদিকে খানাসমূহকে ও খানা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে হস্তান্তর ব্যয় প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশনকে (বিজেএমসি) নেট ঋণ ও অগ্রিম হিসেবে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। নিয়মিতভাবে জ্বালানি মূল্য সমন্বয়ের নিমিত্ত সরকার সূত্রভিত্তিক জ্বালানি মূল্য নির্ধারণের পদক্ষেপ নিয়েছে বিধায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বিপরীতে ভর্তুকি ধীরে ধীরে সংকুচিত হবে। তবে, পূর্ববর্তী বছরের জ্বালানি ভর্তুকি বকেয়া থাকার কারণে এর পরিমাণ আগামী কয়েক বছরে প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে।

সারণি ১৭: নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত							সংশোধিত
নগদ ঋণ								
১। পিডিবি	২৭.৯৪	৩৯.৯৪	৩৫.৫০	-	-	-	-	-
২। বিজেএমসি ও অন্যান্য	১.১৩	১১.৭৯	০.০২	৩৩.৭৫	৫৪.৪৭	২১.০৪	৪২.৯০	২২.৩৪
মোট নগদ ঋণ	**২৯.০৭**	**৫১.৭৩**	**৩৫.৫২**	**৩৩.৭৫**	**৫৪.৪৭**	**২১.০৪**	**৪২.৯০**	**২২.৩৪**
মোট ব্যয়ের শতাংশে	১.২১	১.৯২	১.১০	০.৮৬	১.৩২	০.৪৬	০.৮৩	০.৩৪
ভর্তুকি								
৩। খাদ্য	৯.০৪	২৬.৪৩	১৪.১৫	৬৬.৩০	৪১.৭০	৩৬.৬০	৪৬.৪১	৬৭.৭৭
৪। পিডিবি	-	-	-	৭৯.৬৬	৭৪.৩৯	৮৯.৪৫	১১৯.৬৩	২৩০.০০
৫। গ্যাস ও অন্যান্য	১.৮২	৩.০০	৩৬.০৫	২৫.১৪	৩৫.১৬	৫২.৯৭	১১৪.৮৭	২১৩.০০
মোট ভর্তুকি	**১০.৮৬**	**২৯.৪৩**	**৫০.২০**	**১৭১.১০**	**১৫১.২৫**	**১৭৯.০২**	**২৮০.৯১**	**৫১০.৭৭**
মোট ব্যয়ের শতাংশে	০.৪৫	১.১০	১.৫৬	৪.৩৭	৩.৬৬	৩.৯০	৫.৪২	৭.৭৩
মোট নগদ ঋণ এবং ভর্তুকি	**৩৯.৯৩**	**৮১.১৬**	**৮৫.৭২**	**২০৪.৮৫**	**২০৫.৭২**	**২০০.০৬**	**৩২৩.৮১**	**৫৩৩.১১**
মোট ব্যয়ের শতাংশে	১.৬৬	৩.০২	২.৬৬	৫.২৩	৪.৯৮	৪.৩৫	৬.২৫	৮.০৭
জিডিপি'র শতাংশে	০.১৯	০.৩৫	০.৩২	০.৬৯	০.৬৫	০.৫৭	০.৮২	১.২০

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৪.১৩ রপ্তানি খাতের সম্প্রসারণ ও প্রবৃদ্ধি, প্রবাস আয়ের প্রবাহের সমৃদ্ধি, কৃষি খাতের আধুনিকায়ন, তৈরি পোষাক শিল্প খাতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সেবা রপ্তানি উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিদ্যুৎ চালিত গাড়িসহ অন্যান্য হাইব্রিড প্রযুক্তির প্রচলন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রণোদনা বৃদ্ধির জন্য ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- উভয় পরিকল্পনা দলিলেই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কৃষি ও রপ্তানি খাত প্রতিবছর বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাস আয় প্রেরণ উৎসাহিত করতে ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারও অন্যান্য খাতের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে প্রবাস আয় খাতে প্রণোদনা বাবদ ৬২ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সারণি ১৮: রাজস্ব প্রণোদনা (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
	প্রকৃত						সংশোধিত
১। কৃষি	৩৬.১	৫২	৭৩.৩৬	৭২.৫	৭৬.৩২	১১৮.৬৪	২৬০
২। রপ্তানি	৪০	৪০	৪০	৬০.৪৪	৫৮.৪৬	৭৮	৭৮.২৫
৩। পাটজাত পণ্য	৩.৯৫	৪.৮১	৪.৮১	৫০	৮	১০	১২
৪। প্রবাস আয়	-	-	-	৩০.৬	৩৯.৭৮	৪৪	৬২
মোট প্রণোদনা	**৮০.০৫**	**৯৬.৮১**	**১১৮.১৭**	**২১৩.৫৪**	**১৮২.৫৬**	**২৫০.৬৪**	**৪১২.২৫**
মোট ব্যয়ের শতাংশে	২.৯৮	৩.০১	৩.০২	৫.১৬	৩.৯৭	৪.৮৪	৬.২৪
জিডিপি'র শতাংশে	০.৩৪	০.৩৭	০.৪০	০.৬৭	০.৫২	০.৬৩	০.৯৩

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধ

৪.১৪ সুদ পরিশোধ সরকারের আবর্তক ব্যয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারের মোট ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের অনুপাতের ওপর মূলত: সুদ ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। যদিও সরকার বাজেট ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, সুদ বাবদ ব্যয় হ্রাস করতে সরকার স্বল্পসুদের বৈদেশিক ঋণের সংস্থানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে সরকার সুদ বাবদ পরিশোধ ব্যয় কমানোর জন্য জাতীয় সঞ্চয় পত্রের সুদ হার ও ক্রয়ের পরিমাণ বিষয়ক সংস্কার সাধন করে তা বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর সময়কালে সরকারের সুদ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমলেও বৈশ্বিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সুদের হারে উল্লম্ফনের কারণে সুদ ব্যয় আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র ২২: সুদ-ব্যয় (মোট ব্যয়ের শতকরা হার)

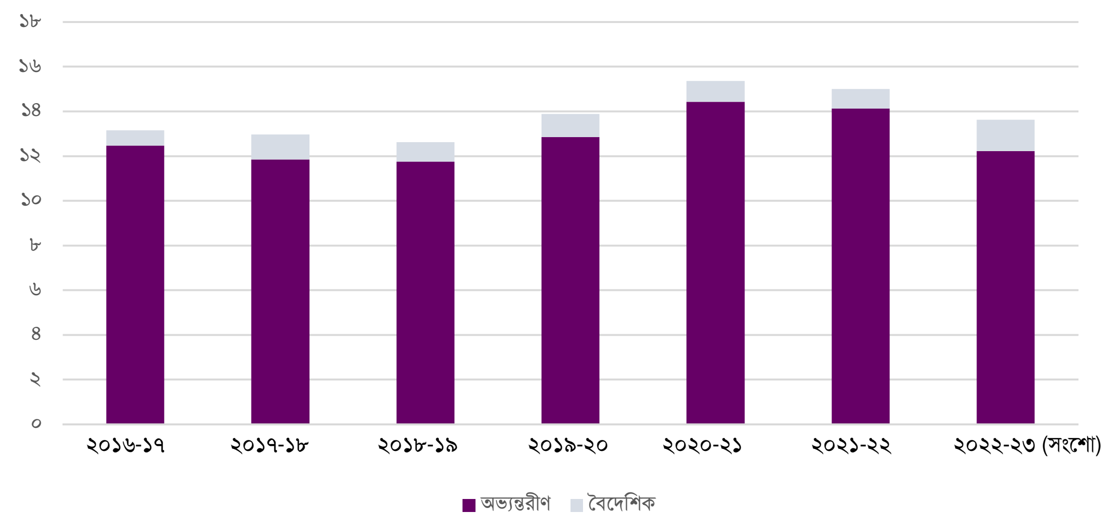

মূলধন ব্যয়ের গতিধারা এবং মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প

৪.১৫ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সরকারের এ মূলধন ব্যয় অর্থনীতির উৎপাদন পর্যায়ে গভীর প্রভাব ফেলে। সরকার মূলত: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বা নন-এডিপি মূলধন ব্যয়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মূলধন ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে জিডিপির ৬.০৯ শতাংশ, যা মধ্যমেয়াদে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপির ৬.৬৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৯: মূলধন ব্যয় ও মধ্যমেয়াদি দৃশ্যকল্প (জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে)

২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	
৫.৪২	৫.৮৯	৫.৬৫	৫.৪৯	৫.৩০	৬.০৯	৬.৫০	৬.৪১	৬.৬৮

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

৪.১৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র মূল উদ্দেশ্য হলো টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি দ্রুত ট্র্যাক করার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ। সরকারি খাতের মূলধন গঠনে অর্থায়নের প্রধান উৎস হলো এডিপি। বিগত বছরগুলোর এডিপি বাস্তবায়নের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এডিপি বাস্তবায়নের হার বেশ উঠা-নামা করেছে। ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের মধ্যে এডিপি বাস্তবায়নের হার বরাদ্দের ৭৬.০ থেকে ৮৮.৬ শতাংশের মধ্যে এবং জিডিপি'র ৩.৬ থেকে ৪.৭ শতাংশের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়াতে সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকার iBAS++ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে; এ প্ল্যাটফর্মে সমস্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একত্রিত করেছে; এবং সরকারি কাজে অর্থের ছাড় ও ব্যবহার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। এছাড়া, গত অর্থবছরে প্রকল্প পরিচালকদের সরকারি বরাদ্দের সব কিস্তির অর্থ ছাড়করণের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এ উদ্যোগগুলো প্রকল্প বরাদ্দের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে, অপচয় কমাতে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মধ্যমেয়াদে এডিপি'র আকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

সারণি ২০: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন (বিলিয়ন টাকা)

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
বাজেট	১,৭৩০.০	২,০২৭.২	২,০৫১.৪	২,২৫৩.২	২,৪৬০.৭
সংশোধিত বাজেট	১,৬৭০.০	২,০১১.৯	১,৯৭৬.৪	২,০৯৯.৮	২,২৭৫.৭
প্রকৃত বাস্তবায়ন	১,৪৭২.৯	১,৫০৭.৮	১,৬০৪.০	১,৮৬০.৬	১১৪৯.৯*
জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে বাস্তবায়ন	৫.০	৪.৮	৪.৫	৪.৭	২.৬
সংশোধিত বাজেটের বিপরীতে বাস্তবায়ন (%)	৮৮.২	৭৪.৯	৮১.২	৮৮.৬	৫০.৫

উৎস: অর্থ বিভাগ, এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; * এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন

কৃষি

৪.১৭ জনবহুল বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বৃহত্তম যোগানদাতা হলো কৃষি খাত। এ দেশের জনগণের সমৃদ্ধিতে, বিশেষ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে, কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুষম প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাত অন্যতম চালিকাশক্তি। এ বিবেচনায় সরকার কৃষি খাতের অগ্রগতির

জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মধ্যমেয়াদে এ খাতে মোট ব্যয় প্রতি বছর গড়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩৮৫ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে।

৪.১৮ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, চাষাবাদ প্রযুক্তি আবিষ্কার, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ন্যায্য মূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ, ট্রান্সজেনিক ফসল উৎপাদন ইত্যাদি। কৃষি খাতে ভর্তুকি প্রদান, নগদ প্রণোদনা, পুনর্বাসন সহায়তা, বিদ্যুৎ বিলের ওপর ছাড়, ভর্তুকি মূল্যে কৃষি ঋণ, ভর্তুকি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদানের সহযোগিতাসহ দেশের জন্য উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গ্রহণ করে স্বনির্ভর, টেকসই ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় মধ্যমেয়াদে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সেচ কার্যক্রমে ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধিকরণ, সেচ পাম্পে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রপ মনিটরিং প্রচলন, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ফসল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা অব্যাহত রাখা।

৪.১৯ দেশের জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচুর পরিমাণে মাছ, মাংস ও দুধ সরবরাহের মাধ্যমে প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে স্বাস্থ্যকর জনসম্পদ তৈরির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। মৎস্য উপখাত দেশের জিডিপিতে ২.৫৩ শতাংশ অবদান রাখছে এবং একইসাথে মোট জনসংখ্যার ১২% এর বেশি লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করছে। অপরদিকে, প্রাণিসম্পদ উপখাত জিডিপিতে প্রায় ১.৯১ শতাংশ অবদান রাখছে। সরকারের অব্যাহত সহযোগিতায় বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া, দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা শীঘ্রই অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে মাছ ও মৎস্য সংক্রান্ত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। মধ্যমেয়াদে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, জাটকা সংরক্ষণ ও জাটকা সংশ্লিষ্ট জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪.২০ কৃষি উন্নয়ন টেকসই করার জন্য পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গৃহকর্ম থেকে শুরু করে কলকারখানাসহ সকল উৎপাদন পর্যায় থেকেই পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষতঃ কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা টেকসই করার লক্ষ্যে বর্তমানে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনাকে প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকার নদী ও খাল খনন/পুনঃখনন, বাঁধ ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নিমাণ এবং উপকূলীয় এলাকায় বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণসহ নানাবিধ কার্যক্রম

অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, সীমান্তবর্তী দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে প্রবেশকারী যৌথ নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৪.২১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে, যা ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছরে দেশের প্রবৃদ্ধি প্রায় ৬.৮ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। তাই, সরকার টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এবং বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে 'মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চালনের মাধ্যমে নাজুক জনগোষ্ঠী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জলবায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে যা ঝুঁকি কমিয়ে আনাসহ ঘাতসহতা তৈরি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৪.২২ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সর্বোচ্চ জোর দিয়েছে। পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ক্ষমতা নিশ্চিত করতে স্বল্প-, মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। গত দেড় দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে ২৭,৩৬১ মেগাওয়াট (ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্যসহ), বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৮,০০০ কিলোমিটার থেকে ১৪,৬৭২ কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ২,৬০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬,২৮,৫৬২ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য উৎস হতে মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯০০ মেগাওয়াট। এছাড়া, সরকার কর্তৃক মোট ১,১৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৬টি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ২,৫৭০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে যার মোট ক্ষমতা প্রায় ৫০ মেগাওয়াট। একইসাথে অফ গ্রিড অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের জন্য ৬ মিলিয়ন সোলার হোম সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪.২৩ জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সরকার জ্বালানি উৎপাদন ও সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ সাল থেকে ১৯টি গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন করা হয়েছে এবং এ সময়কালে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯৮৪ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, সরকার ২০২৪ সালের মধ্যে আরও ৪৬টি অনুসন্ধান কুপ খনন সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে, যা দৈনিক প্রায় ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। একইসাথে, বেশ কয়েকটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা এলএনজি স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশনের দৈনিক সক্ষমতা ২,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করবে।

৪.২৪ বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি উভয় খাতের ব্যয় সাশ্রয়ে সরকার আন্তঃদেশীয় জ্বালানি পরিবহনের জন্য আঞ্চলিক পাইপলাইন নির্মাণ, আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের ওপর ভিত্তি করে জ্বালানির নিয়মিত মূল্য সমন্বয়, জ্বালানি শোধনাগারের ক্ষমতা সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উভয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রিপেইড

মিটার স্থাপন, এবং উপকূলবর্তী ও অফশোর সমীক্ষার মাধ্যমে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে। এছাড়া, জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিতকরণ এবং সিস্টেম লস কমানোর বিষয়টিও অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

৪.২৫ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ নিশ্চিতকরণে সাশ্রয়ী ও সমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, সাশ্রয়ী পরিবহন এবং কার্যকর লজিস্টিক সিস্টেম সাপ্লাই-চেইন ব্যবস্থাপনার জন্য মসৃণ চ্যানেল নিশ্চিত করে এবং একইসাথে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার পরিপূরক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় সড়ক, রেল, সেতু, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল এবং টেলিযোগাযোগ খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে জোর দিবে। মধ্যমেয়াদে এ খাতে মোট ব্যয় প্রতি বছর গড়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪২১.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে।

৪.২৬ একটি উন্নত এবং টেকসই সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বহুবিধ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৪ বা ততোধিক লেনবিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্প, দ্রুতগতির পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণ এবং আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ স্থাপন (যেমন: SASEC প্রকল্প)। সরকার সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে ১ হাজার ২৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১ হাজার ১০০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ৪৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ এবং ৭ হাজার ৩০০ মিটার সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ মুহূর্তে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারসমূহের একটি হচ্ছে মেট্রোরেল লাইন স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন।

৪.২৭ উন্নয়নের ৩০ বছরের মহাপরিকল্পনার আওতায় রেলওয়েকে নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, আধুনিক এবং জনবান্ধব গণপরিবহনে পরিণত করার জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের প্রতিটি জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যে নতুন রেলপথ নির্মাণ, একক ট্র্যাককে ডাবল ট্র্যাকে উন্নীতকরণ, বিভিন্ন গেজ একীভূতকরণ, আন্তঃদেশীয় রেলপথ নির্মাণ, আধুনিক লোকোমোটিভ ও বগি সংগ্রহ, সিগন্যালিং সিস্টেমের আধুনিকীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মধ্যমেয়াদে সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে ২৭৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ২১০ কিলোমিটার বিদ্যমান রেললাইন পুনর্নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৪.২৮ সমন্বিত মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের একটি মূল নিয়ামক হলো নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পরিবহনকে সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর আধুনিকায়ন এবং নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনাসহ নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ নৌপথ সৃষ্টির লক্ষ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪.২৯ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশি ও বিদেশি উভয়ের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিবহনের জন্য বাংলাদেশকে 'আঞ্চলিক হাব' হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বিমানবন্দরের যাত্রী পরিচালনার ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকার ২০২৩ সালের মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল চালু করার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ[৩]

৪.৩০ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া, নাজুক জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি একযোগে পরিচালিত হচ্ছে। সরকার ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি (NSSS), ২০১৫ প্রণয়ন করেছে যার ভিত্তিতে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সংস্কার করা যায় এবং জীবন-চক্রভিত্তিক সেবার কাঠামো সৃষ্টি করা যায়। ২০২১ থেকে ২০২৬ সময়ের জন্য NSSS এর অ্যাকশন প্ল্যান, ফেজ-২ও প্রস্তুত করা হয়েছে। সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের জন্য 'ফ্যামিলি কার্ড' এবং নগদ অর্থ সহজে হস্তান্তরের জন্য জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে যাতে নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের সঠিক উপকারভোগীগণ লাভবান হতে পারেন।

৪.৩১ সরকার নারীর ক্ষমতায়নে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুস্থ মায়েদের জন্য ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিডি) কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা, গর্ভবতী মায়েদের ভাতা এবং স্তন্যদানকারী ও কর্মজীবী মায়েদের ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার মহিলাদের আর্থিকখাতে প্রবেশের জন্য ক্ষুদ্রঋণও বিতরণ করছে। মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশাপাশি সরকার অন্যান্যদেরও বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করছে।

স্মার্ট বাংলাদেশে কর্মসৃজন

৪.৩২ তরুণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত জনশক্তির বিশাল সরবরাহ এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের পটভূমিতে চাকরির বাজারে অনিবার্য পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে সরকার দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি,

---

৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

বিশেষ করে আইসিটি খাতের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং ভবিষ্যৎ চাকরির বাজারে এ বিশাল শ্রমশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী বর্তমানে বেকারত্বের হার ৩.৬ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৪.২ শতাংশ ছিল। বেকারত্বের হার আরও কমাতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় ৬ লক্ষের অধিক লোককে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৩৩ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের ফলে আইটি ফ্রিল্যান্সিং, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার শিল্প, ই-কমার্স, রাইডশেয়ারিং, ফিনটেক, এডুটেক এবং আইএসপি সেক্টরে প্রায় ২ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইটি খাতে পেশাদারদের সংখ্যা বর্তমানের ২ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়নে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অব থিংস, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, বিগ ডাটা, ব্লকচেইন, সাইবার সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, দেশব্যাপী ১৩ হাজারের বেশি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৩০০টি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে।

৪.৩৪ আইটি খাতে বৈশ্বিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইটি বিষয়ক দক্ষ পেশাদার তৈরি করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের মধ্যে ৬০,০০০ জন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ১,০০,০০০ তরুণ-তরুণীকে আইটি পেশাদার হিসাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৭,৮০০ জন তরুণ-তরুণীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সফল বাস্তবায়ন দেশকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, উদ্ভাবনী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং জ্ঞানভিত্তিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সক্ষম করে তুলেছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি -এ চারটি স্তম্ভ বিবেচনা করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ "স্মার্ট বাংলাদেশ: আইসিটি ২০৪১ মাস্টার প্ল্যান'' প্রণয়ন করেছে। এ স্তম্ভগুলো দেশকে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর পথ দেখাবে।

৪.৩৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন পরিপূর্ণ করতে সরকার কতিপয় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ:

- ২০৪১ সালের মধ্যে জিডিপিতে আইসিটি খাতের ২০ শতাংশ অবদান নিশ্চিতকরণ;
- ১০০ শতাংশ সরকারি পরিষেবা ডিজিটালাইজ করা এবং পরিষেবাগুলি মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে আইসিটি খাতের রপ্তানি ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আইসিটি খাতের কর্মসংস্থান ৩ মিলিয়নে উন্নীতকরণ;

- ২০২৫ সালের মধ্যে ১ হাজার বাংলাদেশি স্টার্টআপকে পেশাদার পরামর্শ প্রদান;
- ১০টি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০টি উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন;
- ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্টার্টআপ মূল্যের কমপক্ষে ৫টি ইউনিকর্ন তৈরি;
- প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবোটিক্স, এআই, আইওটি, বিগ ডেটা, ব্লকচেইন, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, এআর/ভিআর সহ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকেন্দ্রিক বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন;
- স্মার্ট ডিজিটাল লিডারশিপ একাডেমি এবং সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

৪.৩৬ রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার শিক্ষা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। মধ্যমেয়াদে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ডিজিটাল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাসহ অন্যান্য চলমান কার্যক্রমগুলো অব্যাহত থাকবে।

৪.৩৭ প্রাথমিক স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকার অবকাঠামো উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকীকরণ, পাঠ্যক্রমের উন্নতি ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য ব্যয় অব্যাহত রাখবে। আগামী অর্থবছরে ১২টি প্রকল্প (৬টি পুরানো এবং ৬টি প্রস্তাবিত) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ফিডিং প্রোগ্রামটি জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ সময়ে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে কক্সবাজার জেলার ৩টি নির্বাচিত উপজেলায় স্কুলের বাইরের কিশোর-কিশোরীদের স্কিলড ফোকাস লিটারেসি পাইলট প্রকল্প হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৩৮ একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক জাতি গঠন করা বর্তমানে সরকারের একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। মধ্যমেয়াদে সরকার সুনীল অর্থনীতির সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ই-সার্ভিস প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য-ভান্ডার সমৃদ্ধকরণ, নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্স ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। এছাড়া, জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ, শিল্প ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জাত নির্বাচন, আণবিক পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ জেনেটিক রোগ শনাক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে রোগ প্রতিরোধের জন্য ভ্যাকসিনের মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা, জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বিবেচনাধীন রয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

৪.৩৯ সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসারে গৃহীত 'আমার গ্রাম, আমার শহর' কর্মসূচি। সরকার মধ্যমেয়াদে ১৮,৩৬০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা, ৬৬,৮০০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট, ২৮,১৭০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা এবং গ্রামীণ এলাকায় ৭৭,০০০ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং ৪১৫টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। একই সময়ে ৭৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন এবং ৩৪০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজও বিবেচনাধীন রয়েছে।

৪.৪০ ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৯টি পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশবান্ধব উপায়ে শক্তি উৎপাদনের জন্য বর্জ্য পোড়ানো বা পুড়িয়ে জৈবসার উৎপাদনের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকার নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে এবং গ্রামীণ এলাকায় প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঢাকা ওয়াসার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৫ সালের মধ্যে ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালীকরণ[৪]

৪.৪১ সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি সুস্থ জাতি বিনির্মাণে সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রূপকল্প-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১, বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ এবং জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ এর সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অন্যতম একটি প্রধান খাত যেখানে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে এবং প্রতি বছর এ খাতে সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করে আসছে। ২০১৭ - ২০২৩ সময়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে, যার ৮৭ শতাংশ বাংলাদেশ সরকার অর্থায়ন করছে। বর্তমান সরকারের যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে ওষুধ শিল্প এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম। দেশে ঔষধের মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয় এবং ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি হয়।

৪.৪২ বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলা করে বিশ্বব্যাপী প্রশংসা অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের মধ্যে রয়েছে। ১ দিনে ১ কোটিরও বেশি ভ্যাকসিন প্রদান করে সরকার জনজীবন রক্ষার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কারণে ১৭ মে ২০২৩ পর্যন্ত সংক্রমণের হার ১৩.২৩ শতাংশ এবং সংক্রামিত মানুষের মধ্যে মাত্র ১.৪৪ শতাংশ মারা গিয়েছেন। অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও এ সংখ্যা অনেক কম।

[৪]স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সারণি ২১: খাতভিত্তিক প্রোগ্রাম ব্যয় (২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬)

খাতের নাম	প্রকৃত		সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
জনপ্রশাসন	৫৬৫.৮	৭৫৫.১	১২৪৮.২	১৬৭৮.৮	১৭৬২.৭	১৮৫০.৯
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৩৫৪.৮	৩৬৯.৪	৪৮০.৭	৪৯৩.৪	৫২৩.০	৫৫৪.৪
প্রতিরক্ষা	৩৫৪.৮	৩৫২.৭	৩৬২.৮	৪১৭.৩	৪৫৯.১	৫০৫.০
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	২৪৪.১	২৬২.০	২৭৯.০	৩২২.৭	৩৪৫.২	৩৬৯.৪
শিক্ষা	৫৯৪.৮	৬০৪.৩	৭০৫.১	৮৮১.৬	১০১৩.৯	১১৬৫.৯
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	১২৪.৫	১৬৭.১	১৪৩.৮	১৫৯.৮	১৮৩.৭	২১১.৩
স্বাস্থ্য	২১৬.৫	২৫০.৩	২৯৭.৪	৩৮০.৫	৪৫৬.৬	৫৪৭.৯
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	২৬৯.৪	৩২৯.৭	৩৯০.৮	৪০৩.৫	৪৬৪.০	৫৩৩.৬
গৃহায়ন	৬৪.২	৬৫.৩	৮৭.০	৭৪.৩	৮১.০	৮৮.৩
সংস্কৃতি, বিনোদন ও ধর্ম	৪০.২	৫১.৪	৭৭.৩	৫৫.৭	৬০.৭	৬৬.২
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	২২৮.৪	২২৭.৫	২৭১.৪	৩৪৮.২	৩৮৩.০	৪২১.৩
কৃষি	১৭০.৪	২৫৩.৫	৩৯৩.৯	৩১৮.২	৩৫০.০	৩৮৫.০
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ	৮৭.২	১০৪.৫	১৪৯.১	১১৮.৮	১৩০.৭	১৪৩.৮
শিল্প ও অর্থনৈতিক সার্ভিস	৩০.০	৩৫.৯	৪২.৯	৫৫.৯	৬১.৫	৬৭.৬
পরিবহন ও যোগাযোগ	৫০২.২	৬০২.০	৭২৯.৫	৮৭৬.৩	৯৬৩.৯	১০৬০.৩
মোট প্রোগ্রাম ব্যয়	৩৮৪৭.৩	৪৪৩১.৩	৫৬৫৮.৮	৬৫৮৪.৯	৭২৩৯.০	৭৯৭০.৮

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ঘাটতি অর্থায়ন এবং টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা

৪.৪৩ বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন এবং ঋণের স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি ঘাটতি অর্থায়নের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে রাজস্ব ঘাটতি অর্থায়ন করে আসছে। এই লক্ষ্যে, বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৫ শতাংশের কাছাকাছি রাখার ফলে ঋণ জিডিপির অনুপাত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ৩৩ শতাংশের আশেপাশে স্থির রয়েছে যা বেশ স্বস্তিকর। একইভাবে, সরকার টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়ার পাশাপাশি বাজেট ঘাটতির সুবিধা এবং ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।

ঘাটতি অর্থায়ন

৪.৪৪ সরকার প্রথাগত নমনীয় উৎসের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণেই আগ্রহবোধ করে। এতে ঋণ গ্রহণের খরচ কমানোর পাশাপাশি সরকারের পছন্দের ঘাটতি অর্থায়নে এই উৎস হতে ঋণ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে, সরকারের চাহিদার তুলনায় নমনীয় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল হওয়ায় অভ্যন্তরীণ উৎস হতে (যেমন ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড এবং সঞ্চয়পত্র) ঋণ নিতে হবে। অভ্যন্তরীণ ঋণ বাজারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার মধ্যমেয়াদে বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ হতে বেশি ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। সরকারের ইসলামিক সিকিউরিটিজ সুকুক ইস্যু চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও এ মুহূর্তে বিশ্ব বাজার হতে ইউরোবন্ড এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের কোন ইচ্ছা সরকারের নেই।

সারণি ২২: বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন (২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬, বিলিয়ন টাকা)

উৎস	প্রকৃত		বাজেট	সংশোধিত	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
মোট অর্থায়ন	১৩০৫.৬	১৮৩৫.৭	২৪৫০.৬	২২৭৫.১	২৬১৭.৯	২৭৯২.৩	৩১৭০.৭
	(৩.৭)	(৪.৬)	(৫.৫)	(৫.১)	(৫.২)	(৫.০)	(৫.০)
বৈদেশিক	৪৮০.৪	৭০৭.৪	৯৮৭.৩	৮৭০.৮	১০৬৩.৯	১২০০.৩	১৩০৬.৪
	(১.৪)	(১.৮)	(২.২)	(২.০)	(২.১)	(২.১)	(২.১)
অভ্যন্তরীণ	৮২৫.১	১১২১.৯	১৪৬৩.৪	১৪০৪.৩	১৫৫৪.০	১৬৭৭.৭	১৮৬৪.৪
	(২.৩)	(২.৮)	(৩.৩)	(৩.১)	(৩.১)	(২.৯)	(২.৯)
ব্যাংক	৩২৬.৭	৭৫৫.৩	১০৬৩.৪	১১৫৪.২	১৩২৩.৯	১৩৮৪.৯	১৫৪৭.৩
নন-ব্যাংক	৪৯৮.৪	৩৬৬.৫	৪০০.০	২৫০.০	২২৯.৬	২৯২.৮	৩১৭.১
সঞ্চয়পত্র	৪৩০.৪	২০৩.৭	৩৫০.০	২০০.০	১৮০.০	১৯১.৪	১৯০.৩
অন্যান্য	৬৮.০	১৬২.৯	৫০.০	৫০.০	৪৯.৬	১০১.৩	১২৬.৯

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, বন্ধনীর () ভিতরের অংক জিডিপির অনুপাত নির্দেশ করে

অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন

৪.৪৫ মধ্যমেয়াদে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের ঋণ গ্রহণ জিডিপির ২.৯ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ অর্থাৎ ট্রেজারি বিল এবং বন্ড থেকে ঋণ গ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। তবে, উচ্চ-সুদের জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণের বৃদ্ধি ন্যূনতম হবে এবং মোট অর্থায়নের মিশ্রণে এর অবদান ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

চিত্র ২৩: বিভিন্ন উৎস হতে ঘাটতি অর্থায়ন (অর্থবছর ২০২০-২১ হতে ২০২৫-২৬, বিলিয়ন টাকা)

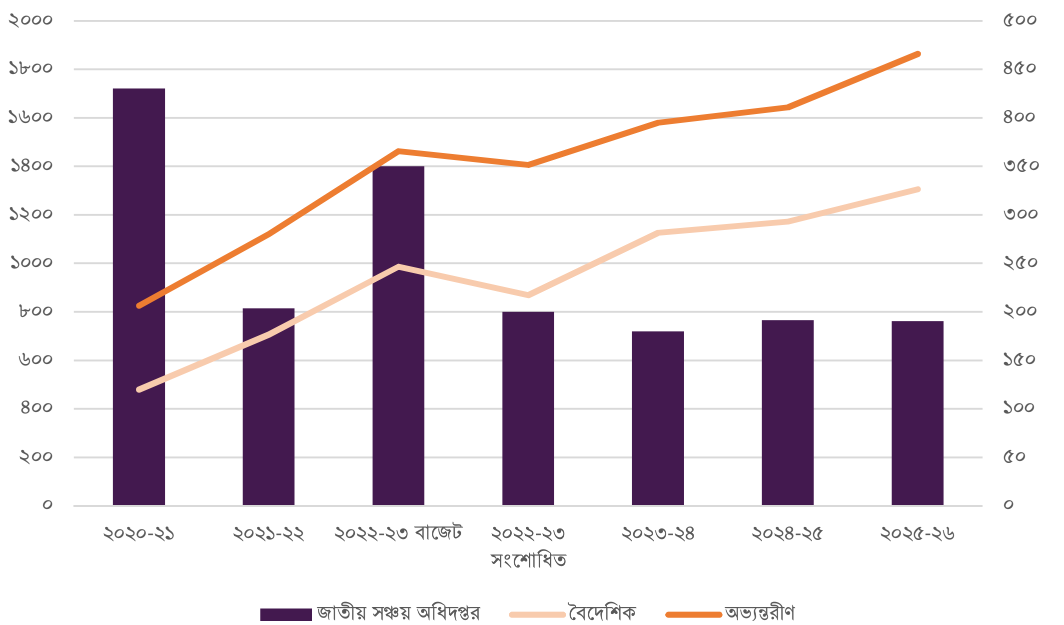

উৎস: অর্থ বিভাগ

বৈদেশিক অর্থায়ন

৪.৪৬ মধ্যমেয়াদে বৈদেশিক উৎস হতে বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপির ২.১ শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সরকারের মেগা প্রকল্পের অর্থায়ন ও বাজেট সাপোর্টের কারণে ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বৈদেশিক অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যদিও নিম্ন সুদের হার, দীর্ঘ গ্রেস পিরিয়ড এবং দীর্ঘ মেয়াদের কারণে নমনীয় উৎসের বৈদেশিক ঋণ সবসময় কাম্য। তবে ঋণের এই প্রবাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত বাজেট সহায়তা পেয়েছে যা মধ্যমেয়াদে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অর্থায়ন ব্যয়

৪.৪৭ ২০২০-২১ অর্থবছরে সুদ বাবদ মোট বাজেটের ১৫.৪ শতাংশ ব্যয় হয়েছিল, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট বাজেটের ১৩.৫ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ সুদের পরিমাণ ১৪.৪ শতাংশ ছিল, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১০.৮ শতাংশে নেমে আসবে যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরও কমে ১১.৬ শতাংশে হবে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১১.৮ শতাংশে ফিরে যাবে। টাকার অবচিতি এবং বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক সুদ ব্যয়ের পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ০.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি

পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১.৬ শতাংশ হবে এবং ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১.৭ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে।

সারণি ২৩: সুদ ব্যয় (বিলিয়ন টাকা)

সুদের ধরণ	প্রকৃত		বাজেট	সং বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
মোট সুদ ব্যয়	৭০৬	৭০৮	৮০৪	৯০০	৯৪৩	১১৫৪	১৩৮৩
	(১৫.৪)	(১৩.৬)	(১১.৯)	(১৩.৬)	(১২.৪)	(১৩.৩)	(১৩.৫)
অভ্যন্তরীণ	৬৬৩	৬৬৩	৭৩২	৮০৭	৮২০	১০০৮	১২০৫
	(১৪.৪)	(১২.৭)	(১০.৮)	(১২.২)	(১০.৮)	(১১.৬)	(১১.৮)
বৈদেশিক	৪৩	৪৬	৭২	৯৩	১২৪	১৪৬	১৭৮
	(০.৯)	(০.৯)	(১.১)	(১.৪)	(১.৬)	(১.৭)	(১.৭)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, বন্ধনীর () ভিতরের অংক মোট বাজেটের অনুপাত নির্দেশ করে

চিত্র ২৪: অন্তর্নিহিত সুদের হার (%)

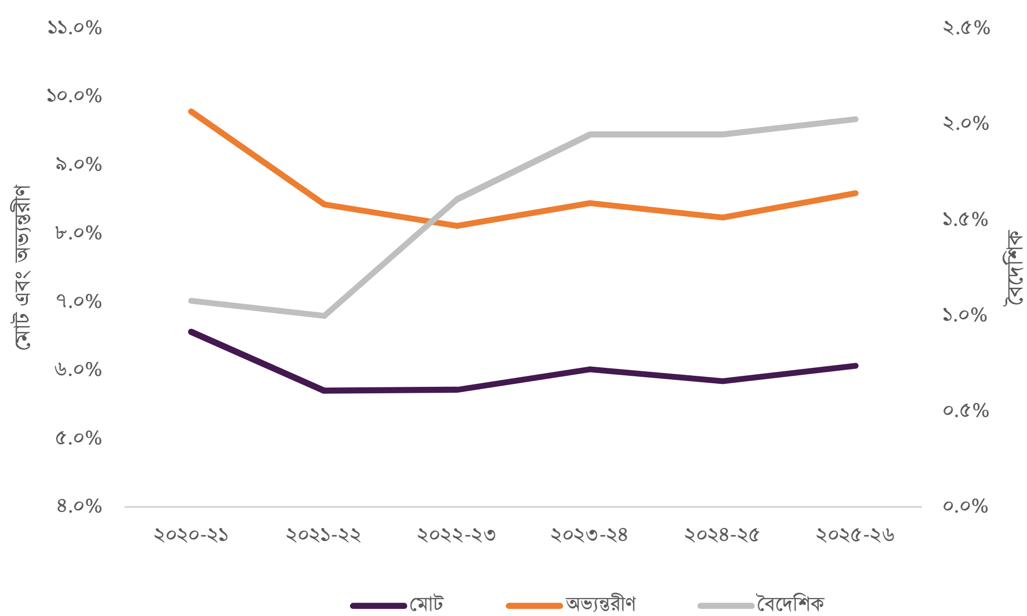

৪.৪৮ নমনীয় উৎসের বৈদেশিক ঋণের সুদ হার কম হওয়া সত্ত্বেও সরকারের ঋণের একটি বড় অংশ জাতীয় সঞ্চয়পত্র হতে গৃহীত হওয়ায় সার্বিক সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যমেয়াদে জাতীয় সঞ্চয় স্কীম হতে অর্থায়নের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে সুদের হার হ্রাস পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৪.৪৯ অভ্যন্তরীণ অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২০-২১ অর্থবছরের ১০ শতাংশ হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮ শতাংশে নেমে আসবে এবং ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা ৯ শতাংশে স্থিতিশীল থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অনমনীয় এবং আধা-নমনীয় ঋণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে এ খাতে সুদের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু, টাকার অবচিতি এবং বৈশ্বিক সুদের হার বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক উৎসের ঋণের অন্তর্নিহিত সুদের হার ২০২০-২১ অর্থবছরের ১ শতাংশ হতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২ শতাংশে উন্নীত হবে। মূল্যস্ফীতির চাপের কারণে বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজের বর্তমান সুদের হার বেশি হওয়ায় সামগ্রিক অন্তর্নিহিত সুদের হার অনেক বেশি যা প্রায় ৬ শতাংশ। মধ্যমেয়াদে সামগ্রিক অন্তর্নিহিত সুদের হার স্থিতিশীল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অর্থায়ন কৌশল

৪.৫০ ঘাটতি অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রয়েছে ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মত বাজারযোগ্য সিকিউরিটিজ এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্র। বৈদেশিক উৎসের মধ্যে রয়েছে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক নমনীয় এবং অনমনীয় ঋণ। সরকার ঘাটতি অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে ২০২১-২২ হতে ২০২৩-২৪ মেয়াদে মধ্যমেয়াদি ঋণ কৌশল (এমটিডিএস) প্রণয়ন করেছে। সরকারের ঘাটতি অর্থায়ন মোটা দাগে এমটিডিএস অনুসরণ করবে। ঋণ কৌশলে সামগ্রিকভাবে কৌশল-২ কে পছন্দনীয় কৌশল হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সঞ্চয়পত্র হতে অর্থায়ন সামান্য হ্রাস পাবে এবং মোট অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ৩৬ শতাংশ অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নমনীয় এবং আধা নমনীয় উৎসের বৈদেশিক ঋণ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদে সরকার বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে অভ্যন্তরীণ ঋণের বাজারকে আরও শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যার ফলে এমটিডিএস এর কৌশল-৪ অনুসারে সুদের ব্যয় হ্রাস পাবে। তবে, জাতীয় সঞ্চয়পত্রের অ-অনুমানযোগ্যতা এবং ব্যাংক খাতে তারল্য প্রবাহের তারতম্যের কারণে কৌশলটি বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে।

ঋণ প্রোফাইল

৪.৫১ ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে সরকারের সামগ্রিক ঋণ স্থিতির বেশিরভাগ অংশই ছিল অভ্যন্তরীণ ঋণ যা মোট ঋণের ৬৪ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বাজারযোগ্য ট্রেজারি বিল ও বন্ডের পরিমাণ ছিল ৫০ শতাংশ এবং সঞ্চয়পত্রের পরিমাণ ছিল ৪৩ শতাংশ অবশিষ্ট অর্থায়ন হয়েছে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের মাধ্যমে। ২০১১-১২ অর্থবছরের পূর্বে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায়

বেশি ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এর আপেক্ষিক পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বৈদেশিক ঋণের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি বহুপাক্ষিক, যদিও এ সময়ে নতুন দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগি থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ উৎস হতে আধা-নমনীয় ঋণ পাওয়া যাচ্ছে। বিগত ১৫ বছরে, সরকারি ঋণ জিডিপি'র অনুপাতে কখনও ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেনি।

চিত্র ২৫: সরকারি ঋণ-জিডিপি অনুপাত

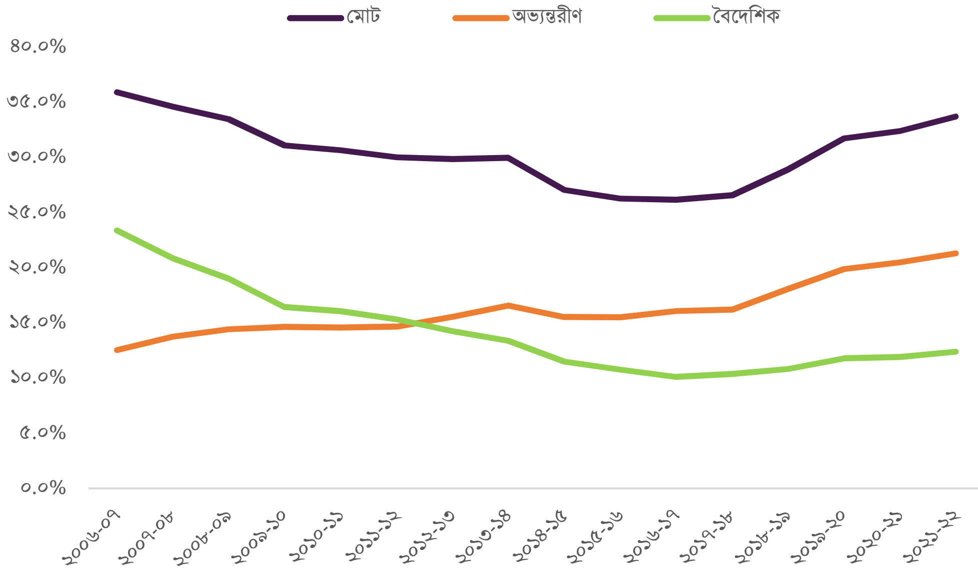

সূত্রঃ অর্থ বিভাগ

ঋণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

৪.৫২ কোভিড-১৯ অতিমারির নেতিবাচক প্রভাব থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে মধ্যমেয়াদে সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি অব্যাহত থাকবে। এর ফলে ঋণ-জিডিপি অনুপাত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩২.৪ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩৮.৫ শতাংশে উন্নীত হবে। জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণ উভয়ই বাড়তে থাকবে এবং বৈদেশিক ঋণের আনুপাতিক বৃদ্ধির হার বেশি হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক ঋণ ও জিডিপি'র অনুপাত ১৪.৮ শতাংশে পৌঁছাবে এবং মোট ঋণের ৩৮.৬ শতাংশ হবে বৈদেশিক ঋণ।

সারণি ২৪: ঋণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (বিলিয়ন টাকা)

খাত	প্রকৃত	বাজেট	সং বাজেট	প্রাক্কলন	প্রক্ষেপণ	প্রকৃত	
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
মোট ঋণ	১১৪৪৩	১৩৩৯০	১৫৭৭৮	১৫৬৯৭	১৮৩২৯	২১১৮০	২৪৩৮৮
	(৩২.৪)	(৩৩.৭)	(৩৫.৫)	(৩৫.১)	(৩৬.৬)	(৩৭.৬)	(৩৮.৫)
অভ্যন্তরীণ	৭২৩৯	৮৪৭৯	৯৯৭৪	৯৯১৭	১১৩৯৩	১৩০৭১	১৪৯৭২
	(২০.৫)	(২১.৩)	(২২.৪)	(২২.২)	(২২.৮)	(২৩.২)	(২৩.৬)
	{৬৩.৩}	{৬৩.৩}	{৬৩.২}	{৬৩.২}	{৬২.২}	{৬১.৭}	{৬১.৪}
বৈদেশিক	৪২০৪	৪৯১১	৫৮০৪	৫৭৮০	৬৯৩৬	৮১০৯	৯৪১৫
	১১.৯	১২.৪	১৩.০	১২.৯	১৩.৯	১৪.৪	১৪.৮
	{৩৬.৭}	{৩৬.৭}	{৩৬.৮}	{৩৬.৮}	{৩৭.৮}	{৩৮.৩}	{৩৮.৬}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, বন্ধনীর () ভিতরের অংক জিডিপির অনুপাত এবং {} মোট ঋণের অনুপাত নির্দেশ করে

ঋণ ধারণ সক্ষমতা

৪.৫৩ নিজস্ব তথ্য এবং উপাত্ত ব্যবহার করে অর্থ বিভাগ সম্প্রতি ঋণ টেকসই বিশ্লেষণ (ডিএসএ) সম্পন্ন করেছে যা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এ যাবৎ সরকার কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এবং বিশ্বব্যাংক এর ডিএসএ'র ওপর নির্ভর করে আসছিল। অর্থবিভাগ আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক এর কারিগরি সহায়তায় তাদের প্রদত্ত ডিএসএ-এলআইসি টেমপ্লেটের ওপর ভিত্তি ডিএসএ সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশের ঋণ সক্ষমতা চরম পরিস্থিতিতেও টেকসই এবং নিরাপদ সীমার মধ্যে রয়েছে। ডিএসএ প্রতিবেদনে ঋণ কৌশল এর উন্নতির ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে এগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় এই বর্ধিত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দেশের আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি বিনিয়োকারীদের আস্থা বৃদ্ধি করবে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি

৪.৫৪ বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বৈদেশিক ঋণের মধ্যে বিভিন্ন মেয়াদের নমনীয় এবং অনমনীয় উভয় ধরনের ঋণ রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে ২.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়াবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ হবে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বেড়ে হবে ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং তারল্য সংকট এড়িয়ে চলতে দক্ষ ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থাপনা জরুরি। যদিও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থায়ন উৎস এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার ফলে এটি সহনীয় সীমার মধ্যে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চিত্র ২৬: বৈদেশিক ঋণের পরিশোধসূচি

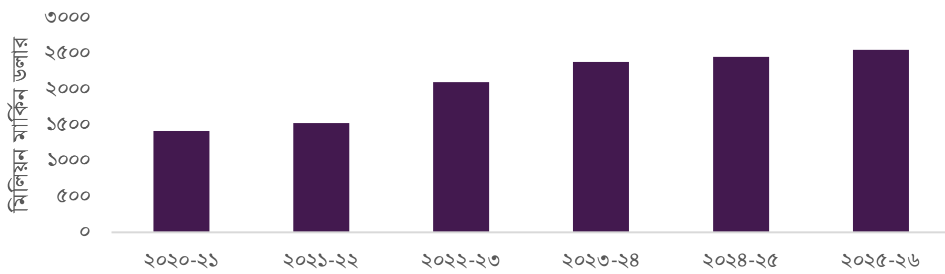

বৈদেশিক ঋণের মুদ্রা মিশ্রণ

৪.৫৫ সরকারের বৈদেশিক ঋণ স্থিতির সিংহভাগ মার্কিন ডলারে নেয়া। ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে বৈদেশিক ঋণের প্রায় ৫০ শতাংশ মার্কিন ডলারে ছিল। এছাড়া, বৈদেশিক ঋণ স্থিতিতে জাপানিজ ইয়েনের পরিমাণ ছিল ২১ শতাংশ এবং ইউরোতে ১৫ শতাংশ; অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য মুদ্রা হলো আরএমবি এবং ব্রিটিশ পাউন্ড। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা ঋণ পরিশোধের খরচের ওপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারে বিধায় সরকার বৈদেশিক ঋণের মুদ্রার মিশ্রণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

চিত্র ২৭: বৈদেশিক ঋণের মুদ্রা মিশ্রণ

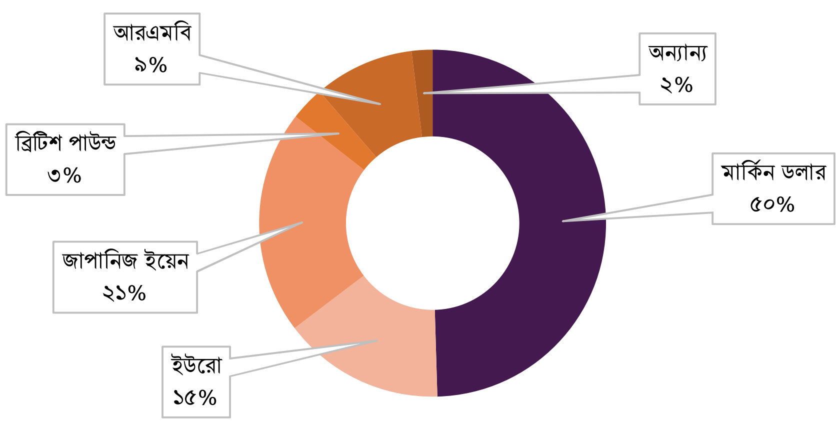

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রচ্ছন্ন দায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের দায়

৪.৫৬ ২০২৩ সালের মার্চ মাস শেষে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির বিপরীতে সরকারের প্রচ্ছন্ন দায়ের পরিমাণ ছিল ১০২৪.৪৩ বিলিয়ন টাকা। চলতি অর্থবছরে নতুন করে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৬০.৬৫ বিলিয়ন টাকার সার্বভৌম গ্যারান্টিতে ইস্যু করা হয়েছে। প্রধানত বাংলাদেশ বিমান, বিদ্যুৎ খাত, সার কারখানা এবং টিসিবি-র অনুকূলে এই গ্যারান্টিগুলি প্রদান করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে সরকারের লক্ষ্য হলো সার্বভৌম গ্যারান্টির সাথে সম্পর্কিত আর্থিক ঝুঁকিগুলি বিবেচনায় নিয়ে তা হ্রাস করার নিমিত্ত গ্যারান্টি নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ। অন্যদিকে, জুন ২০২২ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত দায়ের পরিমাণ ছিল ৪৩১৩.০৪ বিলিয়ন টাকা, যা জিডিপির ১০.৮৫ শতাংশ এবং জুন ২০২১-এ রেকর্ডকৃত ৩৭৭৬.০৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া, জুন ২০২২ শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান কে দেয়া সরকারের ঋণের স্থিতি ৪১৮০.২২ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০২১ সালের শেষে ছিল ৩৫৩৭.২৭ বিলিয়ন টাকা।

সংস্কার এবং স্বচ্ছতা

৪.৫৭ দেশের আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ হলো বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন, স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল এবং সিসিবিএল এর মধ্যে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজের সেকেন্ডারি মার্কেট লেনদেনের প্রবর্তন। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিপর্যায়ের বিনিয়োগকারীরা সহজেই সরকারি সিকিউরিটিজ কেনা বেচায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, যা সেকেন্ডারি বন্ড মার্কেটের পরিধি এবং এর গভীরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এটি কেবল সরকারের বাজেট ঘাটতিকে আরও দক্ষতার সাথে অর্থায়নে সহায়তার পাশাপাশি পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

৪.৫৮ জাতীয় সঞ্চয়পত্র এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইস্যু করা হচ্ছে যা সমগ্র প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে সহজেই বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্ল্যাব-ভিত্তিক সুদের হার, বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা আরোপ। এর ফলে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ হ্রাস পেয়েছে যা সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য। উপরন্তু, সরকার ঋণের হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সম্বলিত 'ডেট বুলেটিন' নিয়মিত প্রকাশ করছে যা সরকারি ঋণের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এ থেকে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, গবেষণা সংস্থা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, উন্নয়ন অংশীদার, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সাধারণ নাগরিকসহ সকলে সরকারের ঋণ সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে, এই সংস্কারগুলি বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে আরো স্বচ্ছ ও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য, যা দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রতিবন্ধকতা সমূহ

৪.৫৯ যদিও বাংলাদেশের সরকারি ঋণের পরিমাণ খুব বেশি নয় এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং বিচক্ষণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে বৈদেশিক ঋণ সঙ্কটের ঝুঁকিও সীমিত তবুও ঋণ ব্যবস্থাপনায় এমন কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যেগুলোতে মনোযোগ দেয়া জরুরী। ঋণ ব্যবস্থাপনায় অন্যতম মূল প্রতিবন্ধকতা হলো নিম্ন রাজস্ব আয় যা অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সরকারি বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্থ করছে। উপরন্তু, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতের নিম্ন অবস্থান ঋণ ধারণ সক্ষমতাকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর নমনীয় উৎসের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যখন কমে আসবে এই সমস্যাটি তখন আরো সক্রিয় ভাবে দেশের আর্থিক অবস্থানকে প্রভাবিত করবে।

৪.৬০ সরকারের অর্থ ব্যবস্থায় আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে উচ্চ-সুদের হার যা সরকারের ঋণ গ্রহণের ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে। অবকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন চাহিদার কারণে এই পরিস্থিতি মধ্যমেয়াদে আরও চ্যালেঞ্জিং হবে। সরকারের বর্তমান ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন অফিস এবং দপ্তর সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন ঋণ অফিস সামগ্রিক ঋণ ব্যবস্থাপনার ও সমন্বয়ের জন্য চ্যালেঞ্জিং, যা দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোবাবিলা করার জন্য, সরকারকে ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাপক ও সমন্বিত পন্থা অবলম্বন করার পাশাপাশি রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ঋণের ওপর নির্ভরতা কমাতে বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা অন্বেষণ করতে হবে। বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি সরকারি ঋণ যাতে টেকসই থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়
আর্থিক ঝুঁকি ও প্রশমন কৌশল

৫.১ এ অধ্যায়ে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতির সমাপ্তিমূলক বক্তব্যসমূহ এবং সরকারের প্রধান আর্থিক কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর্থিক ঝুঁকির উৎস সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আইএমএফ কাঠামো (IMF ২০০৮)[৫] অনুসরণ এবং এর সাথে দেশের আর্থিক ঝুঁকির কারণগুলি খুঁজে বের করতে এক্স-পোস্ট (ex-post) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঝুঁকি পরিস্থিতির পরিমাণগত পূর্বাভাস পরিচালনা করার ক্ষেত্রে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃশ্যপট বিবেচনা করা হয়েছে। সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পরামর্শ কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিশেষে অধ্যায়টি চিহ্নিত আর্থিক ঝুঁকির জন্য প্রশমন কৌশলগুলির ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

৫.২ সরকারি বাজেট বা অন্যান্য আর্থিক পূর্বাভাসে যা প্রত্যাশিত ছিল তার তুলনায় আর্থিক চলকসমূহে স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে বিচ্যুতির সম্ভাবনাকে আর্থিক ঝুঁকি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় (IMF ২০০৮)[৬]। গত তিন দশক ধরে এ বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে। ১৯৯০-এর দশকের আর্থিক সংকট, উত্তরণশীল অর্থনীতির দেশসমূহে গ্যারান্টির ব্যাপক ব্যবহার, বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট এবং সার্বভৌম ঋণ সংকট-এ সব পরিস্থিতি হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আপাতদৃষ্টিতে সঠিকভাবে প্রণীত বাজেট এবং ভাল অবস্থানে থাকা ঋণ পরিস্থিতিতেও অফ-বাজেট বা অফ ব্যালেন্স শিট কার্যক্রম ও অন্তর্নিহিত দায়ের কারণে বড় ধরনের অদৃশ্য ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে। বাজেট ঘাটতি এবং ঋণ কমানোর চাপ কিছুক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমকে বাজেটের বাইরে বা ব্যালেন্স শিটের বাইরে এমনভাবে স্থানান্তর করতে প্ররোচিত করে যা প্রায়শই খরচ এবং ঝুঁকি বাড়ায়। সাধারণভাবে, আর্থিক ঝুঁকি সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়- ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং অজ্ঞতা। রাজস্ব আয় কখনো কখনো বাজেট বা অন্যান্য আর্থিক অনুমান থেকে ভিন্ন হয়। এ ব্যবধানগুলো ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বেশি হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অভিঘাত যেমন: প্রত্যাশা থেকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক

---

[৫] International Monetary Fund. Fiscal Risks: Sources, Disclosure, and Management, 2008. http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4265
[৬] International Monetary Fund. Fiscal Risks: Sources, Disclosure, and Management, 2008. http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4265

চলকসমূহের বিচ্যুতি (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আঘাত, সুদের হার, বিনিময় হার এবং টার্মস অব ট্রেড), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সরকারি গ্যারান্টির আহ্বান এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে হতে পারে। সমস্যা কবলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি সহায়তা প্রদান, এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকির ফলে আর্থিক ঝুঁকি যথাযথভাবে প্রকাশের বিষয়টি নতুন করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

৫.৩ আর্থিক ঝুঁকির বিষয় প্রকাশ করা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে আর্থিক কার্যক্রম এবং এর প্রভাবকে আরো যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। আর্থিক ঝুঁকি সম্পর্কে উন্নত গুণগতমানসম্পন্ন তথ্য বিচক্ষণ আর্থিক নীতি তৈরিতে সহায়তা করে, আরো ভালভাবে আর্থিক ঝুঁকি প্রশমন করে এবং নীতিমালাসমূহের ভাল প্রতিক্রিয়া প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। ঝুঁকি বাড়লে নীতিগুলো আরও দ্রুত সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন এবং আর্থিক নীতিগুলো কীভাবে অভিঘাতগুলোর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখাবে সে বিষয়ে আরো ভাল কৌশল স্থাপন করা প্রয়োজন। ঝুঁকি সীমিত করার জন্য কিছু পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে (যেমন: জারী করা গ্যারান্টিগুলির বার্ষিক সীমা জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্ধারণ এবং অনুমোদন করা যেতে পারে) এবং নীতিনির্ধারকগণ অন্যান্য ব্যয় প্রস্তাবের বিপরীতে ঝুঁকির (যেমন, নতুন গ্যারান্টি) প্রভাব পরিমাপ করতে পারেন। এর ফলে বাজেট অগ্রাধিকার বিষয়ে অধিকতর ভাল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এছাড়া, ঝুঁকির প্রকাশ সরকারের হিসাব ব্যবস্থার ওপর আস্থা জোরদার করে, যা ঋণের ব্যয় কমায় এবং বাজারে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করে। তাই, আর্থিক ঝুঁকি চিহ্নিত করা একটি দেশের অর্থ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকির উৎস

৫.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশ ও বিদেশে সামষ্টিক অর্থনীতিতে অভিঘাত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাসহ বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক ঝুঁকি উদ্ভূত হতে পারে। অন্যান্য প্রচলিত ক্যাশ ভিত্তিক সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশের বাজেটিং এবং অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম আর্থিক ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দুর্বলতার সম্মুখীন হয়, যার মধ্যে রয়েছে সম্পদ এবং দায় সম্পর্কে তথ্যের অভাব এবং চলতি লেনদেন সম্পর্কে অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত তথ্য। আর্থিক ঝুঁকিগুলো তিন প্রকার হতে পারে- (ক) সাধারণ অর্থনৈতিক ঝুঁকি, যেগুলো যে কোন ধরনের সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকে আঘাত হতে উদ্ভূত (যেমন পণ্যের দাম , জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিনিময় হার); (খ) নির্দিষ্ট আর্থিক ঝুঁকি, যা প্রধানত প্রচ্ছন্ন দায় থেকে উদ্ভূত, তা সরাসরি বা অন্তর্নিহিত যাই হোক না কেন; এবং (গ) কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, যেমন দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনমনীয়তা। সামগ্রিকভাবে আর্থিক ঝুঁকিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ব্যয় সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং রাজস্ব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি।

ব্যয় সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

৫.৫ অপ্রত্যাশিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন: জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে আঘাত, মূল্যস্ফীতি, বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের দাম পরিবর্তন (বিশেষ করে তেল, জ্বালানি এবং সারের দাম

ভর্তুকি বিলের মাধ্যমে ব্যয়কে প্রভাবিত করে), রাজস্ব এবং সরকারি ঋণের স্থিতি ও গতিপ্রকৃতি থেকে সাধারণ অর্থনৈতিক ঝুঁকি উদ্ভূত হতে পারে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসমূহে এমন কয়েকটি খাত চিহ্নিত করা হয়েছে যারা প্রচুর পরিমাণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করে আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

ক. কোভিড হতে উদ্ভূত অভিঘাত:

৫.৬ কোভিড-১৯ অতিমারি জনগণের জীবন ও জীবিকাকে বিপন্ন করেছে এবং দেশের দীর্ঘস্থায়ী সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করেছে যার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্রয়োজন হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে উদ্ভূত সংকট মোকাবিলা এবং অর্থনীতিতে অতিমারির সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি সামগ্রিক প্রণোদনা কর্মসূচি প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনাটি চারটি মূল কার্যক্রম হলো- সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, আর্থিক সহায়তা প্রদান, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি এবং মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশ সরকার ২৮টি আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজ সমন্বিত একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে যার পরিমাণ ২৩৭৬.৭৯ বিলিয়ন টাকা (২৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের জন্য মোট আর্থিক ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫০ বিলিয়ন, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০৮.৯১ বিলিয়ন এবং ২০২১-২২ অর্থবছর-এ ৪৭২.৬৯ বিলিয়ন টাকায়।

চিত্র ২৮: সরকারের রাজস্ব আদায় (বিলিয়ন টাকা)

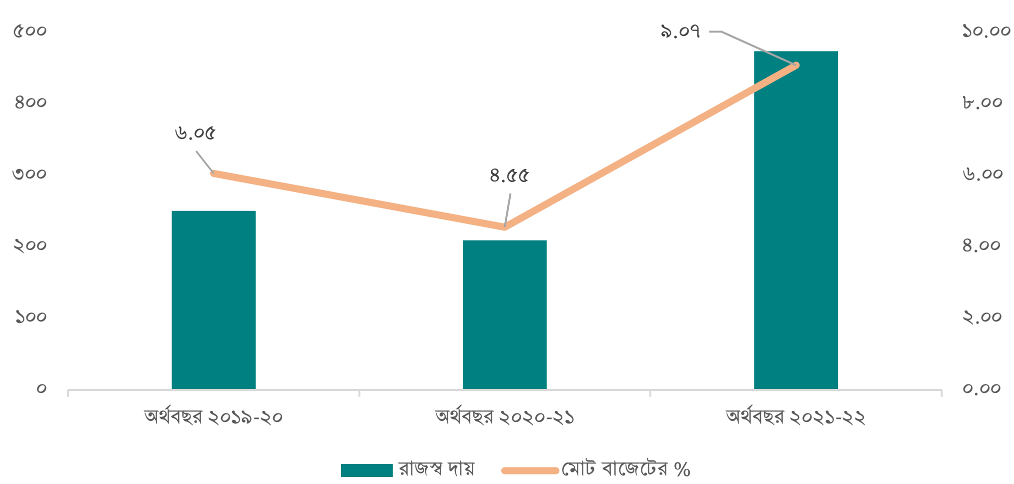

সূত্র: অর্থ বিভাগ

৫.৭ ঘোষিত ২৮টি প্যাকেজের জন্য বরাদ্দকৃত ২৩৭৬.৭৯ বিলিয়ন টাকার মধ্যে ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৮৩৯.০৮ বিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৭৭.৩৮ শতাংশ। এ আর্থিক

প্রণোদনা প্যাকেজগুলো এখনও চলমান। তদুপরি, চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুরুতে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্যাকেজে অতিরিক্ত ৩০০ বিলিয়ন টাকা যোগ করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র (কুটির শিল্প সহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্যাকেজে অতিরিক্ত ২০০ বিলিয়ন টাকা যোগ করা হয়েছে। দেশের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ডিজাইন, পরিকল্পনা এবং সমন্বয় করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৮টি প্যাকেজের আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭,৬৫,৩২,০৫৩ জন এবং ২,৩৬,৮৬১টি প্রতিষ্ঠান।

খ. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চরম ঘটনাবলির প্রভাব:

৫.৮ জলবায়ুজনিত বিপর্যয় যেমন গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, মৌসুমী বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, সামুদ্রিক অম্লীকরণ ইত্যাদি দেশের ব্যাপক উন্নয়নের গতিপথে চাপ সৃষ্টি করছে। ফলশ্রুতিতে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও মানব কল্যাণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জার্মানওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১[৭] অনুযায়ী, জলবায়ুজনিত চরম ঘটনার ফলে ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ৭ম অবস্থানে রয়েছে। গত ৪০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে আনুমানিক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে ০.৫ থেকে ১ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি হ্রাস করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ দুর্যোগ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ২০২১ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের কারণে ২০১৬-২০২১ সাল পর্যন্ত গড়ে ১.৩২ শতাংশ বার্ষিক জিডিপি কম হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংক্রান্ত চরম ঘটনাগুলো সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপরও গুরুতর চাপ সৃষ্টি করে কারণ সরকারকে ত্রাণ কার্যক্রম চলমান রাখা ও ক্ষতিগ্রস্তদের বর্ধিত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, বাড়ি এবং অন্যান্য অবকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করতে হয়। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ঝুঁকিগুলোর জন্য সাধারণত সরকারকে পরবর্তিতে বাজেট পুনর্বন্টন, জরুরি ঋণ গ্রহণ এবং উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয়।

৫.৯ বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে তার বার্ষিক বাজেটের প্রায় ৬-৭ শতাংশ[৮] অভিযোজন উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণুতা বাড়ানোর জন্য ব্যয় করে, যার মধ্যে ৭৫ শতাংশ আসে দেশীয় সম্পদ থেকে। প্রকৃতপক্ষে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দুর্বলতাগুলো মোকাবিলায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেননা, দেশের উন্নয়ন উদ্যোগের ওপর এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বাজেট ব্যয়ের প্রাক্কলন এবং জলবায়ু বাজেট

[৭] Germanwatch. Global Climate Risk Index, 2021, https://www.germanwatch.org/en/19777

[৮] Government of Bangladesh. Bangladesh National Adaptation Plan 2023-2050, 2022. http://www.moef.gov.bd/site/news/110358e4-670c-4058-b20f-e7ab6c89feb9/National-Adaptation-Plan-of-bd-2023-2050

প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। বর্তমানে প্রতিবেদনটিতে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বাজেট বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে, সরকারের ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ দ্বারা পরিচালিত জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য ৩২,৪০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের ৮.৫৬ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৭,০৫২ কোটি টাকা যা উক্ত ২৫টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেট বরাদ্দের ৮.৯৯ শতাংশ।

বক্স ৩: হাওর অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার আর্থিক প্রভাব

হাওর অঞ্চলের নয়টি জেলায় গত মে-জুন, ২০২২ সময়কালে আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। বন্যায় অর্থনীতির প্রায় সব খাতেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি খাত, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাসহ সব ধরনের অবকাঠামো ও মানবজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। মোট ২.৭ মিলিয়ন মানুষ এবং দেশের ১০% ভূখণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের ৭,১৯৬.৭৭ কোটি টাকা প্রয়োজন। আকস্মিক বন্যার বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামতের জন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ১,৭০০ কোটি টাকা (১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। বন্যার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত প্রচেষ্টা সরকারের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা সৃষ্টি করে।

চিত্র ২৯: ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু বাজেট (তাদের মোট বাজেটের %)

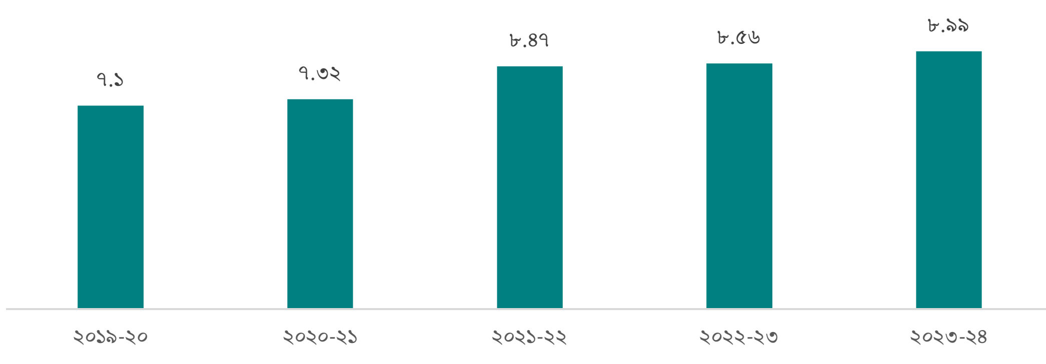

নোট: ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংখ্যা বাজেটের শতকরা হার। অন্যদিকে অন্যান্য অর্থবছরের সংখ্যা প্রকৃত খরচের শতকরা হার

সূত্র: অর্থ বিভাগ

গ. বিনিময় হার ঝুঁকি:

৫.১০ বিনিময় হারের ওঠানামা বিভিন্নভাবে আর্থিক ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস এবং টাকার সাম্প্রতিক অবচিতির ফলে আমদানি ব্যয় এবং নির্ধারিত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিনিময় হারে হঠাৎ করে অবচিতি ঘটলে সরকারের ঋণ বাড়তে পারে। যদিও বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে বিনিময় হার স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু টাকার সাম্প্রতিক অবচিতি বিভিন্নভাবে আর্থিক ভারসাম্য এবং ঋণের সামগ্রিক পরিমাণকে প্রভাবিত করছে। এই অবচিতি সরকারের রাজস্ব এবং ব্যয় উভয়ের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। রাজস্বের ক্ষেত্রে প্রভাব আমদানি-সম্পর্কিত শুল্কের সাথে জড়িত। ব্যয়ের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রধান খাতগুলো হল: (১) সারে প্রদত্ত ভর্তুকি বিল; (২) তেল আমদানির জন্য বিপিসিকে অর্থ প্রদান (ধ্রুবক ভলিউম ধরে নেওয়া); (৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক অর্থায়নকৃত অংশ (মূলধন ব্যয়); এবং (৪) বৈদেশিক ঋণের সুদ প্রদান।

৫.১১ মুদ্রার বিনিময় হারের উর্ধ্বগতি সরকারের ভর্তুকি ব্যয়কে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার দ্রুত অবচিতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশকে খাদ্য, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ বাড়িয়ে ৪০২৬৫ কোটি টাকা করতে হয়েছিল। এ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি প্রয়োজন; তাই ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এটিকে বাড়িয়ে ৫০৯২৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর এর বাজেটে সম্ভাব্য ভর্তুকি প্রদানের জন্য মোট ৬৬৭৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে এক টাকার অবচিতির ফলে বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি প্রদানের পরিমাণ ৪৭৩.৬ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি টাকার অবচিতির ফলে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক সরকারি প্রকল্প, বিশেষ করে মেগা প্রকল্প আমদানি পণ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এভাবে, বিনিময় হারের অবচিতির ফলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা তৈরি করতে পারে।

৫.১২ সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময় হারের ওঠানামা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশে সরকারি ও সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণের পরিমাণ ৩৬৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৬৬ বিলিয়ন এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩৭১ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছাবে। বিনিময় হারের অনিয়মিত পরবির্তনের কারণে এ ঋণের পরিমাণ কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে তা নিরূপণ করতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক একটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণে দুটি দৃশ্যপট অনুমান করা হয়েছে: প্রথম ক্ষেত্রে টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হারে টাকার ১০ শতাংশ অবচিতি এবং অপরক্ষেত্রে টাকার ১০ শতাংশ উপচিতি। দেখা যাচ্ছে যে, টাকার ১০ শতাংশ অবচিতির ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে সরকারি ও সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ৪০২ বিলিয়ন টাকায়। বিপরীতে টাকার মান ১০ শতাংশ উপচিতিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণের পরিমাণ নেমে যাবে ৩৩৩ বিলিয়ন টাকায়। সামগ্রিকভাবে বিনিময় হারের অবচিতি মধ্যমেয়াদে কিছুটা হলেও

আর্থিক বোঝা বাড়াতে পারে, তবে এ ধরনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ঋণের মাত্রা সর্বোচ্চ টেকসই সীমার মধ্যেই থাকবে।

চিত্র ৩০: বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে সরকারি ও সরকারি গ্যারান্টিযুক্ত ঋণ পরিস্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

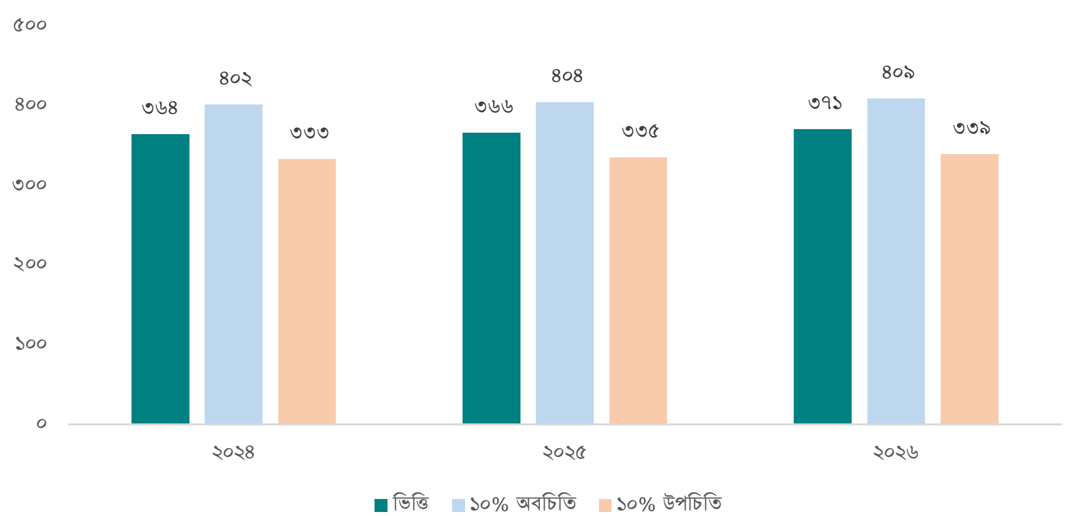

সূত্র: অর্থ বিভাগ

ঘ. প্রচ্ছন্ন দায়:

৫.১৩ আর্থিক ঝুঁকিগুলো প্রায়শই সরকারি প্রচ্ছন্ন দায়ের সাথে যুক্ত থাকে। সাম্প্রতিককালে প্রচ্ছন্ন দায়বদ্ধতা সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট আর্থিক ভূমিকা হ্রাস অনেক সরকারকে তাদের বাজেট ব্যয় কমানোর সুযোগ দিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি খাত প্রত্যাশিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হলে সরকার উদ্ধারে এগিয়ে আসবে এমন সুস্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত প্রতিশ্রুতি রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এ ধরনের গ্যারান্টি এবং প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যত সরকারি অর্থায়নের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে। মূলত: পাবলিক ফাইন্যান্স বিশ্লেষণের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোতে সরকারি বাধ্যবাধকতা এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক ঝুঁকিগুলো প্রকাশ না করার ফলে এরূপ হচ্ছে। প্রচ্ছন্ন দায় পরিশোধ (অর্থাৎ, একটি অনিশ্চিত ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতা) এর বাধ্যবাধকতা উল্লেখযোগ্য আর্থিক ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। প্রচ্ছন্ন দায় সুস্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে শর্তগুলো স্পষ্টভাবে নীতি বা আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অপরদিকে, যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে সরকার সহায়তা দেবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়।

আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রচলিতভাবে সরকারের চুক্তিভিত্তিক বা আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত সুস্পষ্ট প্রচ্ছন্ন দায়কে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে।

৫.১৪ নন কন্ট্রাকচুয়াল প্রতিশ্রুতিগুলোও টেকসই আর্থিক খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন দায়গুলোর অদৃশ্য এবং/অথবা অনিশ্চিত প্রকৃতির কারণে সরকার প্রায়শই সময়মত তাদের মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয় না। কিন্তু দায়গুলোর আকার বেড়ে সমস্যা আরো বাড়িয়ে তুললে শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করা যায়। সরকারের মৌলিক সুস্পষ্ট প্রচ্ছন্ন দায় SOE এবং PPP প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ সরকার প্রথাগতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চুক্তিবদ্ধ ঋণের বিপরীতে গ্যারান্টি প্রদান করে। এসকল বেশিরভাগ ঋণই বিভিন্ন সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করে। চুক্তিকারী সংস্থা যদি সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গ্যারান্টি আহ্বান করা হয় এবং অর্থ প্রদানের দায় সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ফলস্বরূপ, এ গ্যারান্টিগুলো শেষ পর্যন্ত সরাসরি সরকারি ঋণে পরিণত হতে পারে।

৫.১৫ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্প (পিপিপি) ও আর্থিক ঝুঁকির উৎস হতে পারে। পিপিপি এখন দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবকাঠামো বিনিয়োগে অর্থায়নের অন্যতম উৎস। এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশেও জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু পিপিপি প্রকল্পসমূহের প্রত্যক্ষ খরচ এবং সুস্পষ্ট ও অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন দায় সরকারের জন্য আর্থিক ঝুঁকির জন্ম দিতে পারে। এটি উন্নয়ন খাতে সরকারের অর্থ সংগ্রহের ক্ষমতাকেও বাধাগ্রস্ত করতে পারে। পিপিপি নির্মাণ প্রকল্পগুলোকে অপ্রত্যাশিত, উচ্চ-ঝুঁকি এবং পরিবর্তনপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অধিকন্তু, অনেক সরকারের দীর্ঘমেয়াদি বাজেট কাঠামো নেই, তাই ভবিষ্যতের বছরগুলোতে পিপিপি খাতে ব্যয়ের বিষয়টি প্রায়ই ধর্তব্যে নেওয়া হয় না। তাই, পিপিপি-র ক্ষেত্রে ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং (ভিজিএফ)-এর আকস্মিক প্রয়োজন একটি দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষের ওপর অতিরিক্ত বাজেটের চাপ আরোপ করতে পারে। বর্তমানে ২.২৪ বিলিয়ন টাকা ভিজিএফ বাধ্যবাধকতাসহ 'জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর (ঢাকা বাইপাস) সড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্প এবং ৩০৫.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভিজিএফ বাধ্যবাধকতাসহ 'ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ' প্রকল্প নামে দুটি পিপিপি প্রকল্পের জন্য আর্থিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় প্রকল্পটি কিছু বিনিময় হার ঝুঁকিও তৈরি করে। যাইহোক, বর্তমানে ভিজিএফ এর জন্য অন্য কোন আবেদন নেই যা এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কম আর্থিক ঝুঁকি নির্দেশ করে। অন্যদিকে কোভিড-১৯ বা মূল্যস্ফীতির মতো যে কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা প্রকল্পের ব্যয় এবং ভিজিএফের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দিতে পারে।

রাজস্ব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি

৫.১৬ কমপ্লায়েন্স বা প্রতিপালন সংক্রান্ত ঝুঁকি ও রেগুলেটরি ঝুঁকি এ দুই এর সমন্বয়ে রাজস্বের ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি তৈরি হয়। করদাতারা কেন বকেয়া কর প্রদান করেন না সে সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া খুবই প্রয়োজন। কর দায় সম্পর্কে অজ্ঞতা বা কর ফাঁকি - বিপরীতমুখী এ দুটি কারণে

বকেয়া কর পরিশোধ করা হয় না। কর প্রদান না করার কারণগুলোর বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত কারণগুলো সংশোধন এবং সমাধান করা সম্ভব। ঝুঁকির শ্রেণির ওপর ভিত্তি করে করদাতাদের আলাদা করা যেতে পারে এবং রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর জন্য ঝুঁকির ধরনের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে। কর সংক্রান্ত প্রবিধান এবং কর দায় বুঝতে সাহায্য করার জন্য করদাতাদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে। সহজ নিবন্ধন এবং তথ্য পূরণ প্রক্রিয়া, ট্যাক্স রিটার্ন জমার সময় ও রিটার্নে সন্নিবেশের জন্য তথ্য প্রদান, করদাতাকে ফরম পূরণে সহায়তা করা, কর প্রদান সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করার মাধ্যমে কর আদায় বাড়বে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক নিরীক্ষা ও তদন্ত পরিচালনার মাধ্যমে অধিকতর যাচাই-বাছাই এবং সত্যতা নিরুপণ প্রয়োজন হবে।

৫.১৭ কর অব্যাহতি সরকারের পরোক্ষ খরচ। অযৌক্তিক ছাড় সরকারের আর্থিক ঝুঁকি বাড়ায় এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করতে পারে। কর ছাড়ের কারণে সরকারের রাজস্ব হারানোর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য প্রথমে বেঞ্চমার্ক (Benchmark) করের হার নির্ধারণ করা প্রয়োজন। করদাতাদের প্রদত্ত বিদ্যমান কর ছাড়, রেয়াত, বিশেষ ব্যবস্থা, বিলম্বিত প্রদান সুবিধা ইত্যাদির একটি তালিকা করা প্রয়োজন যাতে এই জাতীয় সিদ্ধান্তগুলোর যৌক্তিকতা এবং কার্যকারিতা নিরুপণ করা যায়। কর ছাড়ের কারণে রাজস্ব হারানোর সম্ভাব্য পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য কর অফিসসমূহ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য অফিসের মধ্যে সহযোগিতার বিস্তৃতির মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্যতা এবং তথ্য বিনিময় নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। যদিও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত ট্যাক্স সুবিধাগুলোর বেশির ভাগই আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অপরিহার্য, তবে অন্যান্য শিল্পে এই ধরনের কর সুবিধাগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং প্রদানের পূর্বে ও পর নিয়মিত বিরতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খরচ-সুবিধা (Cost-Benefit) পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অন্যান্য আর্থিক ঝুঁকি

৫.১৮ উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলো ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণ রয়েছে যার ফলে সরকারের ব্যয় প্রক্ষেপণ থেকে ভিন্ন হতে পারে। পণ্যের মূল্য এবং সুদের হারের মতো কারণগুলো থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ আর্থিক ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে অতিরিক্ত গতিশীলতা প্রয়োজন হতে পারে যা সরকারের আর্থিক দায় বাড়াবে। অন্যদিকে, সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় এখন বাংলাদেশের মোট আর্থিক ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট আনুমানিক সুদ পরিশোধের পরিমাণ ৯০,০১৩ কোটি টাকা যা মোট ব্যয়ের ১৩.৬ শতাংশ। ফলে, সুদ প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন অভিঘাত আর্থিক ভারসাম্যের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।

৫.১৯ কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা যেমন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর পুনঃমূলধনীকরণ এবং তাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাও সামষ্টিক আর্থিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কাঠামোগত বা

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা সীমিত করতে পারে। বিশেষ করে, দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ এবং সরকারের বিভিন্ন স্তর ও সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে বা ঝুঁকি সনাক্তকরণে এবং বিকল্প ব্যবস্থা নিতে সরকারের সক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ও ঝুঁকি বাড়াতে পারে কারণ এ ধরনের ক্ষেত্রে নীতিগত ত্রুটির সম্ভাবনা বাড়তে পারে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর দুর্বল ব্যালেন্স শিট এবং তাদের অনাদায়ী ঋণের জন্য সরকারের মূলধন প্রদানের প্রয়োজন হতে পারে যা সরকারের আর্থিক বোঝা বাড়াতে পারে। এছাড়া, জনমিতিতে বার্ধক্য উপনীত জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রদত্ত পেনশনের বাড়তি পরিমাণের কারণে অতিরিক্ত আর্থিক ব্যয় হতে পারে।

সমাধানে করণীয়

৫.২০ আর্থিক ঝুঁকি প্রশমনের জন্য সরকার বিভিন্ন ঝুঁকি প্রশমন কৌশল গ্রহণ করেছে যার মধ্যে রয়েছে- ঝুঁকি স্থানান্তর এবং হ্রাস, সম্ভাব্য ঝুঁকির প্রেক্ষিতে ফিস্কাল বাফার (Fiscal Buffer) তৈরি করা এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি বহুমুখীকরণ। এক্ষেত্রে আরো উন্নতির সুযোগ রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে: আর্থিক বিশ্লেষণ এবং বাজেটে আর্থিক ঝুঁকিকে অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক ঝুঁকির উৎস চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থায় উন্নতি এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কর ছাড় যৌক্তিকীকরণ করা।

৫.২১ ঝুঁকি হ্রাসের একটি কার্যকর কৌশল হচ্ছে দায় স্থানান্তর। সম্প্রতি সরকার আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে যা আর্থিক বোঝা কিছুটা লাঘব করেছে। সরকার একটি পর্যায়ক্রমিক সূত্র-নির্ভর জ্বালানি মূল্য সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু করবে যার ফলে পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলোর জন্য কোনও কাঠামোগত ভর্তুকির প্রয়োজন হবে না। তবে, সরকার এখনও বিদ্যুৎ বা গ্যাস খাতে ভর্তুকির ক্ষেত্রে এমন কোন নীতি গ্রহণ করেনি।

৫.২২ সম্ভাব্য ঝুঁকির বিপরীতে বাফার তৈরি করে রাখা একটি ভাল প্রশমন কৌশল হতে পারে। বর্তমানে সরকার তার বাজেটে থোক বরাদ্দ (Block Allocation) রাখে যা অপ্রত্যাশিত ব্যয় মোকাবিলায় সহায়তা করে। রাজস্ব আহরণে গতিশীলতা আনয়ন কার্যক্রম বেগবান করার সাথে সাথে ভর্তুকি প্রদানের মতো ক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাস সরকারের ফিস্কাল স্পেস (Fiscal Space) তৈরি করতে পারে যা সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

৫.২৩ রাজস্বের ক্ষেত্রে রাজস্ব আহরণের উৎসকে বৈচিত্র্যময়করণ ঝুঁকি কমানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত NBR করের একটি বড় অংশ আসে পরোক্ষ কর থেকে। মোট NBR করের মধ্যে ৪০.৫০ শতাংশ ভ্যাট, ৩০.২১ শতাংশ আয়কর, ১৪.৩৭ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক, ১২.৮৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং বাকিটা আবগারি, রপ্তানি শুল্ক এবং

অন্যান্য কর থেকে আহরিত হয়েছে। কিছু নির্দিষ্ট আইটেম হতে কর আদায়ের নির্ভরতা আর্থিক ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এ আর্থিক ঝুঁকি কমাতে রাজস্ব আয়ের নতুন উৎসসমূহ খুঁজে বের করতে হবে।

৫.২৪ আর্থিক ঝুঁকিগুলোকে অধিকতর কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় আর্থিক ঝুঁকির বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, আর্থিক ঝুঁকির উৎসগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পরিমাপ করা এবং হালনাগাদ করা যেতে পারে। উপরন্তু, কর অব্যাহতির যৌক্তিকতা নির্ধারণ সরকারের আর্থিক ঝুঁকি কমাতে পারে এবং আর্থিক সংস্থান বাড়াতে পারে।

৫.২৫ বাংলাদেশ অর্থনীতি মধ্যমেয়াদে কোভিড পূর্ব প্রবৃদ্ধির ধারা অতিক্রম করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। বর্ধিত চাহিদা এবং সরকারি খাতচালিত যোগান ব্যবস্থার উন্নয়ন এ উচ্চ প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। কার্যকরভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির সার্বিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতাগুলো ধীরে ধীরে দূর করা হচ্ছে। দেশের প্রবৃদ্ধির গতিপথকে ত্বরান্বতি করতে রাজস্ব আহরণে গতিশীলতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সামনের দিনগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। জনগনের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য অর্জন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্মার্ট সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সতর্ক পরিকল্পনার মাধ্যমে দুরন্ত বেগে ছুটে চলার জন্য প্রস্তুত বাংলাদেশ।

সামষ্টিক অর্থনীতি অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mof.gov.bd